BANSDOC Library * Dhaka *

নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৬

★ ডিশ এন্টেনা ও স্যাটেলাইট রিসিভার

★ জ্বালানীর জগতে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ

★ ওমেগা - ৩ ডিম ?

★ মানব শরীরতত্ত্বঃ শ্বসন

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : জুন, ২০১৬

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব সৈকত সরকার
উপ-প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা
জনাব পপি মণ্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা / মুদ্রণালয় :
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

সূচিপত্র

➢ মানব শরীরতত্ত্ব : শ্বসন — ১
— কামরুন নাহার

➢ জ্বালানির জগতে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ — ৬
— প্রকৌশলী মোঃ টিপু সুলতান

➢ জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি : মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার জ্যোতির্বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে পুরোধা ব্যক্তিত্ব — ৮
— শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

➢ ডিশ এন্টেনা ও স্যাটেলাইট রিসিভার — ১২
— কাজী রিতি ইসলাম

➢ সবজি, ফল-ফলাদি কেনার সময় সাবধান থাকুন — ১৫
— কৃষিবিদ আলী আকবর

➢ কোয়ান্টাম পথের কথা — ১৮
— সৌমেন সাহা

➢ রপ্তানিযোগ্য ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও রপ্তানি অব্যাহত রাখতে আমাদের করণীয় — ২৫
— ড. মোঃ শরফ উদ্দিন

➢ ওমেগা-৩ ডিম? — ২৮
— মোঃ খোরশেদ আলম

➢ নতুন ৪টি আইসোটোপ আবিষ্কার এবং সবুজ রসায়নে গ্রাফিনের ব্যবহার — ৩১
— শহীদ হোসেন

➢ সূর্যের চাকতির উপর বুধ গ্রহের চলন — ৩৪
— মাসুদুর রহমান

➢ ৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা — ৩৭

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন 'বিজ্ঞানী' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা 'নবীন বিজ্ঞানী'র জুন-২০১৬ সংখ্যা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহার ফলে ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় ১০টি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সাথে জুন-২০১৬ মাসের ০২ হইতে ০৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার কেন্দ্রীয় আয়োজনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জেলার প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের নাম ও প্রকল্প বিবরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান চর্চায় এবং তাহাদের মেধা ও মননকে উদ্ভাবন চর্চার সাথে সম্পৃক্ত করিয়া উৎসাহিত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকাশনায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ আগ্রহী ব্যক্তিদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করিবার সামান্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করিলে প্রচেষ্টাটি সার্থক হইবে। সময়মতো প্রকাশনাটি প্রকাশকার্যে নিয়োজিত প্রেস ও সহকর্মীদের জন্য রহিল আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ প্রকাশনায় প্রবন্ধ পাঠাইয়া যেসব গুণগ্রাহী প্রবন্ধকার প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহাদের প্রতিও রহিল আন্তরিক ধন্যবাদ। সকলের সহযোগিতায় প্রকাশনার কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করি।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মানব শরীরতত্ত্ব : শ্বসন

কামরুন নাহার

শ্বসন (Respiration)

জীবজগতের জীবজ শর্ত হচ্ছে, কোষে প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি এবং প্রোটোপ্লাজমে বিপাক ক্রিয়া চালু রাখা। আর বিপাক ক্রিয়া নির্ভর করে শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর। বিপাক ক্রিয়াপথে হাজারও ধরনের রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন শক্তির। শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর ঘটে ও তা সঞ্চার হয়. তাই শ্বসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপাক প্রক্রিয়া।

শক্তির উৎস হচ্ছে শর্করা, প্রোটিন ও লিপিড নামক বৃহৎ অণু অথবা এদের মনোমার। এর মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ হচ্ছে প্রধান শ্বাসনিক উপাদান। শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহৎ অণুগুলো সরল অণুতে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে সেখানে উপস্থিত রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয়ে গতিশক্তিতে সঞ্চারিত হয়। এটি বিপাক প্রক্রিয়ার একটি অপচিতিমূলক পদ্ধতি।

শ্বসন এক ধরনের জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। শ্বাসনিক উপাদান নির্দিষ্ট পথে পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি ধাপ স্বতন্ত্র এনজাইমে নিয়ন্ত্রিত হয়, পর্যায়ক্রমিক ধাপ অতিক্রমকালে প্রাথমিকভাবে কিছু শক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জারণ-বিজারণ পথে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কিছু রাসায়নিক উপাদান অর্থাৎ ATP এর সৃষ্টি হয়। এই ATP-ই তখন জীবের সব ধরনের শরীরবৃত্তীয় কাজের শক্তি জোগায় সুতরাং শ্বসন হচ্ছে শক্তি সঞ্চারকারী একটি শক্তিশালী জারণ-বিজারণকারী বিক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জীবকোষস্থ জটিল জৈব যৌগগুলো জারিত হয়ে শক্তিযুক্ত (ATP) যৌগে পরিণত করে এবং পানি ও CO_2 উপজাত হিসেবে নির্গত হয়, তাকে শ্বসন বলে।

জারণ প্রক্রিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে ঘটে থাকে। এর ফলে উৎপাদিত রাসায়নিক শক্তি $NADP^+$ এবং NAD^+ বা ATP তে আবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ জীবে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে, যা নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে থাকে–

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{রাসায়নিক শক্তি + তাপ}$$

(গ্লুকোজ) (অক্সিজেন) (কার্বন ডাই-অক্সাইড) (পানি) শক্তি + তাপ

শ্বসনস্থল

শ্বসন প্রক্রিয়া দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে গ্লুকোজ অণু O_2 এর অনুপস্থিতিতে বা উপস্থিতিতে আংশিক জারিত হয়ে পাইরুভিক এসিড গঠন করে। এ অংশের বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় এনজাইম কোষের সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়, প্রথম পর্যায় (অবাত শ্বসন) কোনো অঙ্গাণুর মধ্যে নয়, বরং সাইটোপ্লাজমে ঘটে বলে ধারণা করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে পাইরুভিক এসিড O_2 এর উপস্থিতিতে ভেঙে CO_2 ও পানিতে পরিণত হয়। এই অংশের বিক্রিয়ার এনজাইমগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ায় পাওয়া যায় বলে দ্বিতীয় পর্যায়টি তাই মাইটোকন্ড্রিয়ার ঘটে। প্রোক্যারিওটিক জীবে (ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল) মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকায় সাইটোপ্লাজমের এনজাইমের সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন হয়, অনেক ব্যাকটেরিয়ায় কোষঝিল্লি সংলগ্ন মেসোজোম অংশে শ্বসন ঘটে।

শ্বসনের প্রকারভেদ

জীবদেহে প্রধানত দুই রকমের শ্বসন ঘটে; যথা– (১) মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শ্বসন বা সবাত শ্বসন (Aerobic respiration); (২) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে শ্বসন বা অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)।

১। **সবাত শ্বসন :** যে শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কোষ মধ্যস্থ খাদ্যবস্তু প্রধানত গ্লুকোজ বিভিন্ন এনজাইম ও কো-এনজাইমের সহায়তায় পরিবেশীয় অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে খাদ্যস্থিত স্থিতিশক্তিতে তাপীয় ও গতিশক্তি রূপেতে বিমুক্ত করে দেয়, তদসঙ্গে উপজাত বস্তু হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি নির্গত হয়, তাকে সবাত শ্বসন বলে। অর্থাৎ, যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে সবাত শ্বসন বলে।

সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightleftharpoons[\text{কো-ইনজাইম}]{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি (688Kcal)}$$

সবাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : সবাত শ্বসনের প্রক্রিয়াটি চারটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। কোষস্থিত প্রধান শ্বসন বস্তু গ্লুকোজ বিভিন্ন এনজাইম বিক্রিয়া দ্বারা উক্ত পর্যায়গুলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও শক্তি উৎপন্ন হয়। পর্যায়গুলো হলো–

ধাপ : ১। গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) : এই প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিড ($C_3H_4O_3$) উৎপন্ন করে, এই ধাপে চার অণু ATP (দুই অণু খরচ হয়ে যায়) এবং দুই অণু NADH + H^+ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না, তাই গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পর্যায়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে।

ধাপ-২। অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি : গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে ২ কার্বনবিশিষ্ট এক অণু অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম-এ (Acetylco A), এক অণু CO_2 এবং এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন করে (দুই অণু পাইরুভিক এসিডে থেকে দুই অণু অ্যাসিটাইল কো-এ; দুই অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং দুই অণু NADH + H^+ উৎপন্ন করে।

ধাপ-৩। ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) : ক্রেবস চক্রে ২ কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল কো-এ জারিত হয়ে দুই অণু CO_2 উৎপন্ন করে। ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ Sir Hans Krebs এ চক্রটি আবিষ্কার করেন বলে একে ক্রেবস চক্র বলা হয়। এ পর্যায়ে অ্যাসিটাল CO–A মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও এ চক্রে এক অণু অ্যাসিটাইল কো-এ থেকে তিন NADH + H^+; এক অণু $FADH_2$ এবং এক অণু GTP উৎপন্ন করে। অতএব দুই অণু অ্যাসিটাইল কো-এ থেকে চার অণু CO_2, ছয় অণু NADH + H^+ দুই অণু $FADH_2$ এবং দুই অণু GTP উৎপন্ন হয়।

ধাপ- ৪। ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র (Electrontransport System) : এ প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত তিনটি ধাপে উৎপন্ন NADH + H^+, $FADH_2$ জারিত হয়ে ATP, পানি, ইলেকট্রন ও প্রোটন উৎপন্ন হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনসমূহ ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় শক্তি নির্গত হয়। সে শক্তি ATP তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়।

শ্বসন প্রক্রিয়াটির প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ :

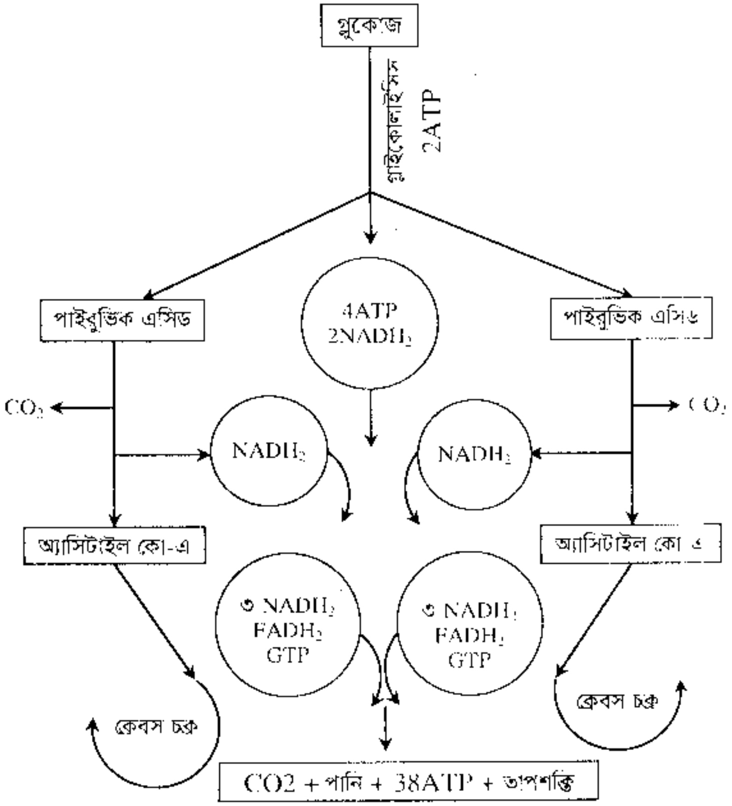

চিত্র : শ্বসন প্রক্রিয়া

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট হয় অণু CO_2, ছয় অণু পানি এবং ৩৮ টি ATP উৎপন্ন করে, নিচের চার্টে তা দেখানো হলো–

শ্বসনের পর্যায়	উৎপাদিত বস্তু	ব্যয়িত বস্তু	নীট উৎপাদন
গ্লাইকোলাইসিস	২ অণু পাইরুভিক এসিড ৪ অণু ATP	২ অণু $NADH + H^+$ ২ অণু ATP	৬ ATP ২ ATP
অ্যাসিটাইল কো-এ	২ অণু অ্যাসিটাইল কো-এ ২ অণু CO_2 ২ অণু $NADH + H^+$	২ অণু পাইরুভিক এসিড	২ অণু CO_2 ৬ ATP
ক্রেবস চক্র	৪ অণু CO_2 ৬ অণু $NADH + H^+$ ২ অণু $FADH_2$ ২ অণু GTP	২ অণু অ্যাসিটাইল কো-এ	৪ অণু CO_2 ১৮ ATP ৪ ATP ২ ATP
			৩৮ ATP (নীট মোট ATP)

২। **অম্লক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণ :** শ্বসন দেহ তরলের স্বাভাবিক p^H (7.4) নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৩। **দেহের তাপমাত্রা সুস্থির রাখা :** শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু জারনকালে পানি গ্যাসীয় দশায় পরিণত হয়ে তাপ শোষণে সহায়তা করে এবং এর ফলে দেহের তাপমাত্রা সর্বদা সুস্থির থাকে।

৪। **উদ্বায়ী ধাতব পদার্থের দেহ থেকে বিমুক্তিকরণ :** শ্বসনের মাধ্যমে অ্যালকোহলসহ কিছু উদ্বায়ী পদার্থ দেহের বাইরে বিমুক্ত হয়ে বিষক্রিয়া প্রশমিত করে।

৫। **পাম্পক্রিয়া :** ডায়াফ্রমে এবং বক্ষপ্রাচীরে ছন্দময় সঞ্চালন উদর এবং বক্ষ গহবরের চাপে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের নিম্নভাগ থেকে উদরীয় অঞ্চলে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, এর ফলে দেহে হিমোস্ট্যাসিস নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুই ধরনের হতে পারে, যথা–

(ক) বাহ্যিক প্রভাবক : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ হলো–

১। **তাপমাত্রা :** ২০° সে. এর নিচে এবং ৪৫° সে. এর উপরের তাপমাত্রায় শ্বসনের হার কমে যায়. শ্বসনের জন্য উত্তম তাপমাত্রা ২০° সে. থেকে ৪৫° সে.।

২। **অক্সিজেন :** সবাত শ্বসনে পাইরুভিক এসিড জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে, কাজেই অক্সিজেনের অভাবে সবাত শ্বসন কোনোক্রমেই চলতে পারে না।

৩। **পানি :** পরিমিত পানি সরবরাহ শ্বসন ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে, কিন্তু অত্যন্ত কম কিংবা অতিরিক্ত পানির উপস্থিতিতে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৪। **কার্বন ডাইঅক্সাইড :** বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার কিঞ্চিত কমে যায়।

৫। **আলো :** শ্বসন কার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্যি কিন্তু দিনের বেলা আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকায় O_2 গ্রহণও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ শক্তি : অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ হলো–

১। **খাদ্যদ্রব্য :** শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য ভেঙে শক্তি, পানি ও CO_2 নির্গত করে। তাই কোষে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **উৎসেচক :** শ্বসন প্রক্রিয়ায় বহুবিধ এনজাইম বা উৎসেচক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, কাজেই এনজাইমের ঘাটতি শ্বসনের হার কমিয়ে দেয়।

৩। **কোষের বয়স :** অল্পবয়স্ক কোষে বিশেষ করে ভাজক কোষে প্রোটোপ্লাজম বেশি থাকে বলে বয়স্ক কোষ অপেক্ষা শ্বসনের হার বেশি হয়।

★ *প্রবন্ধকার নবম শ্রেণির ছাত্রী, হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা।*

জ্বালানির জগতে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ

প্রকৌশলী মো: টিপু সুলতান

জীবাশ্ম প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা কাটাতে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন অনেক আগে থেকেই। তাদের গবেষণার এক অংশ হিসেবে আসে জৈব জ্বালানির কথা। জৈব জ্বালানি হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা লঘুকরণে একটি কার্যকরী উপায়। সাধারণত সকল জৈব-জ্বালানিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। জৈব-অ্যালকোহল (যেমন : ইথানল যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিকভাবে ভুট্টা হতে তৈরি করা হয়) আর জৈব-ডিজেল (যা সাধারণত ফ্যাটি এসিড হতে উৎপন্ন হয়)। এদের উভয়ই গ্যাস কিংবা ডিজেলের সাথে মিশ্রিত করা হয় তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। তবে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে এদের ব্যবহার করতে বিশেষভাবে তৈরি ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়। আর বাজারে যেসব আধুনিক অন্তর্দহন ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তাতে এগুলো খুব একটা কার্যকর নয়। তাছাড়া এসব জ্বালানি ইঞ্জিনে ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট পরিশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। পরবর্তী ধারার বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জৈব জ্বালানি ব্যবহার করা যায় এমন প্রত্যয়ে এই ধরনের এমন এক জ্বালানি তৈরি করেছেন, যা বর্তমানে যেসব ইঞ্জিন জীবাশ্ম জ্বালানিতে চলে তাতে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূণ। এই জ্বাল্যনি জেনেটিকভাবে পরিবর্তন করা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয় (University of Exeter) এর জন লাভের নেতৃত্বাধীন একদল গবেষক 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর গবেষণাপত্রে তুলে ধরেন যে, তারা এমন এক জৈব জ্বালানি তৈরি করেছেন, যা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

'আধুনিক ইঞ্জিন জীবাশ্ম জ্বালানি উচ্চমানের হওয়া লাগে। আর জীবাশ্ম জ্বালানি এই উচ্চমান প্রকাশে সক্ষম'। জন বলেন, যদি এই জৈব জ্বালানির সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত জ্বালানি গ্যাসের সাথে মিশ্রিত করা হয় তা জ্বালানির মানের অবনতি ঘটায়। তাই তার দল এমন এক নতুন শংকর জ্বালানি উদ্ভাবন করতে লেগে যান, যা পেট্রোলিয়াম হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন জ্বালানির মতো কাজ করতে পারে এবং আজকের দিনের ইঞ্জিনে কাজ করে। যে বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হয় তা হলো মাটি হতে জ্বালানি খনন না করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় এমন জ্বালানি তৈরি করা।

দলটি প্রথমে এমন এক সজীব পদার্থের সন্ধান করেন, যা এমন সব উপাদান (নির্দিষ্টভাবে বলতে অ্যালকেন বা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন) প্রস্তুত করতে সক্ষম যা জীবাশ্ম জ্বালানিকে তার শক্তি সরবরাহ করে। অনেক এককোষী জীব এমন অ্যালকেন তৈরি করে যার উপাদান অনেকটা পেট্রোলিয়ামের মতো। দীর্ঘ নয় বছর পরেও জন-এর বায়োপ্রস্পেক্টিং-এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। অতঃপর সিনথেটিক জীব বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন, যদি প্রকৃতিতে এরকম কোনো এককোষী জীবের নকশা না থাকে তাহলে এরকম জীব আমরা আমাদের পদ্ধতি ব্যবহার করে আর প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করে নিতে পারি।

চূড়ান্তভাবে দেখা যায়, জন এবং তার দল ই. কোলাই (Escherichia coli) এর চর্বি প্রস্তুতকরণের পদ্ধতিটিকেই অপহরণ করে নেন। এই ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার কুখ্যাতি রয়েছে কারণ এর বিশেষ অংশ খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং মানুষের মধ্যে অসুস্থতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে এর অনেক ধরন ক্ষতিকর নয়, আমাদের পাকস্থলীতে বাস করে স্বাভাবিক ব্যাকটেরিয়াল ব্যবস্থার অংশ হিসেবে। ই. কোলাই আমাদের অতি পরিচিত আর বিজ্ঞানীরা এর সম্পর্কে অনেক জানেন। তাই তারা এটাও জানেন যে, এই ধরনের জেনেটিক কার্যকলাপের জন্য এটিই সবচেয়ে ভালো প্রার্থী। ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক মেটাবলিক পদ্ধতি কৌশলে বশে আনা হয়। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ১০টির মতো জিনের সামান্য পরিবর্তন সাধন করে জন এবং তার দল ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যকে চর্বিতে রূপান্তর করেন যা পরবর্তীতে অ্যালকেন এ রূপান্তর করা সম্ভব। "আমরা নির্দিষ্টভাবে এমন অণু তৈরির প্রচেষ্টায় ছিলাম যার প্রয়োজন বর্তমানে জ্বালানি শিল্পের, আর আমরা এটি আলবৎ পেরেছি, তবে একটু ক্ষুদ্র ভাবে। এই পর্যায়ে এটি প্রাথমিক প্রদর্শনীর প্রমাণ", বলেন জন।

এখন জন এবং তার দল তাদের প্রস্তুতকৃত অণুসমূহকে তাদের প্রাকৃতিক বিকল্পের সাথে তুলনা করার প্রত্যয়ে ব্যস্ত। তারা প্রস্তুত প্রণালি কোষীয় পর্যায়ে আরও কার্যকর করার আশা করছেন, আর এর ফল হিসেবে আশা করছেন জ্বালানিটির শক্তির মাত্রা আরও বাড়ানোর। জন বলেন, ভাগ্যক্রমে আমাদের এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য কিছু টাকা হাতে আছে। গবেষকদের বর্তমানে এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়- আর তা হলো এর মাত্রা বাড়ানো অর্থাৎ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। অসংখ্য গবেষণায় পরীক্ষাগারে জ্বালানি তৈরির যথেষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, তবে সারা দেশজুড়ে সরবরাহের জন্য এই জটিল প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন আসলেই চিন্তার বিষয়। জন বলেন, 'এই প্রাথমিক গবেষণার পর তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে একটি জীবচক্রের বিশ্লেষণ, যাতে আমরা উৎপাদন প্রণালির কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাই। এর পর একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা তৈরি করা যা হতে শত শত কিংবা এমনকি হাজার খানেক লিটার জ্বালানি কয়েক বছর তৈরি করবে। এরপর একটি পূর্ণ মাত্রার বাণিজ্যিক ব্যবস্থা। যদি সব কিছু ভালোমতো হয় তাহলে আমরা সম্ভবত ১০ বছরের মতো সময় চিন্তা করছি।"

★ *প্রবন্ধকার বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল), চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও সম্পাদক, চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব।*

জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি : মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

জ্যোতির্বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে পুরোধা ব্যক্তিত্ব

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

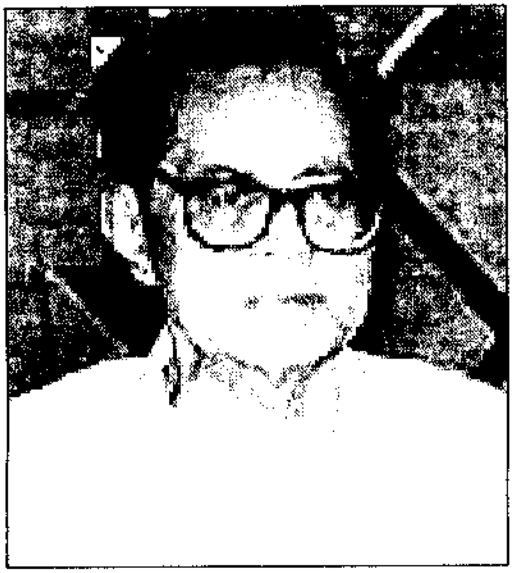

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৯১৫-১৯৯৩)

যাঁর হাত দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে, তিনি হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার গণিতের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনমনে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করে গেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো দুরূহ বিষয়কে সর্বসাধারণের মাঝে পরিচয় করে দেওয়ার দায়িত্বও তিনি একাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। রচনা করেছেন একের পর এক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।

আবদুল জব্বার জন্মেছিলেন বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। সালটা ১৯১৫। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তো বটেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসেও সালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এর দশ বছর পূর্বে ১৯০৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব। আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। এসব আবিষ্কার অনেকের মতো সেদিনকার মেধাবী তরুণ গবেষক আবদুল জব্বারের চিন্তাকেও নাড়া দিয়েছিল। তাই তো তিনি ১৯৪৯ সালেই রচনা করেন 'বিশ্ব রহস্যে নিউটন ও আইনস্টাইন' শীর্ষক একটি অসাধারণ গ্রন্থ।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৯১৫ সালে পাবনার সুজানগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে সম্মানসহ এম.এস.সি. তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে গণিতের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর তিনি বদলি হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার পর সেখানে একটি ছোট মানমন্দির ছিল। এই দূরবিনের সাহায্যে শিক্ষার্থীদেরকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করানো হতো। এখান থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর লেখালেখির শুরুটাও সেখান থেকেই বলা যায়। ওই সময়ের বিভিন্ন পত্রিকা যেমন– মোহাম্মদী, সওগাত, পাঠশালা ইত্যাদিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর তিনি রাজশাহী কলেজে যোগ দেন। এই কলেজে যোগদানের পর তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে তিনি গণিত বিভাগের প্রধান হিসেবে তৎকালীন ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে কলেজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলো তখন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও পর্যন্ত পেল। লেখালেখি, প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি এ সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ারও প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

১৯৮০ সালে অধ্যাপক আবদুল জব্বার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন। তবে অবসরের চার বছরের মাথায় পুনরায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ড. রশীদ প্রফেসর' হিসেবে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। তবে এই ফিরে আসা ছিল তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার স্বীকৃতির নিদর্শন বলা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য অধ্যাপক আবদুল জব্বার নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত মানমন্দির ব্যতীত কাজটি যে সহজ নয়, সে কথা তাঁর অজানা ছিল না। সে ধরনের মানমন্দির স্থাপন কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তা এবং প্রচুর অর্থের। এগুলো তিনি পাননি। তবুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে নিজ উদ্যোগে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য কিছু কিছু মডেল ধরনের সরঞ্জাম তিনি তৈরি করেন। তারই প্রমাণ, তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম সেলেসিয়াল গ্লোব বা খ-গোলক যা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিচের তলায় রক্ষিত আছে। এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতে অনেকাংশে সহায়তা করবে

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ও তাঁর নির্মিত 'খ-গোলক'

গণিতের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি শখের বশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে একসময় লেখালেখির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। রচনা করতে থাকেন একের পর এক গ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : বিশ্ব-রহস্যে নিউটন ও আইনস্টাইন (১৯৪৯), বিশ্ব-রহস্য (১৯৫১), খ-গোলক পরিচয় (১৯৬৫), তারা-পরিচিতি (১৯৬৭), প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা (১৯৭৩), বিশ্ব ও সৌরজগৎ (১৯৮৬) ও আকাশ পট (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য। এসবের পাশাপাশি প্রায় দু'যুগ ধরে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ করে, তৎকালীন পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রতি মাসেই 'নাইট স্কাই অব দি মান্থ' বা 'এ মাসের আকাশ' নামে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তারা-পরিচিতি' গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর মূল্যায়ন এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা পুস্তক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই উভয় বাংলায় পূর্বে বেরোয় নি, আগামী শত বৎসরের ভিতর বেরুবে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত আবদুল জব্বার রচিত এই 'তারা-পরিচিতি' গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' বলে তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়।" জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে আমাদের দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, লেখক ও সমাজবিজ্ঞানী বদরুদ্দীন উমর লিখেছে, "এ দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু আবদুল জব্বারই হলেন এক্ষেত্রে এক পথিকৃৎ। এমন এক পথিকৃৎ যিনি তাঁর নিজের সময়ে ছিলেন নিঃসঙ্গ।"

১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি' গঠিত হয়। অধ্যাপক আবদুল জব্বার ছিলেন এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮৫-৮৬ সালে ঐতিহাসিক 'হ্যালির ধূমকেতু' পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে ঢাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ৭৬ বছর পরপর হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এর পর্যবেক্ষণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে সারা বিশ্বের পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে ক্রয় করা হয় ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি প্রতিফলক দুরবিন। সে সময় বাংলাদেশে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় দুরবিন। এ দুরবিনটি ক্রয় করা হয়েছিল তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত এক লক্ষ টাকা দিয়ে। এর সঙ্গে বিজ্ঞান জাদুঘর থেকে আনা হয়েছিল একটি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের স্মিট ক্যাসেগ্রেইন দুরবিন। প্রকৃতপক্ষে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্য এই দুটি দুরবিন সংগ্রহের ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুল জব্বারের ভূমিকাই ছিল প্রধান। বলতে হয়, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৫-৮৬ সালের হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ সফল হয়েছিল। এই হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ঘিরে গড়ে ওঠে নানা সংগঠন। এর পেছনে আবদুল জব্বারের নিরবচ্ছিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাই ছিল মূল প্রেরণার উৎস।

১৯৮৭ সালে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের সফলতা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ দেখে বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে 'প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স' নামে একটি স্বল্পমেয়াদী পাঠক্রম চালু করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করা। আবদুল জব্বার তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষার্থীদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর আরাধ্য কাজ, সাধনা ও ত্যাগের কিছুটা বাস্তবায়ন হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদুল জব্বারকে একদম কাছ থেকে দেখা। সেই স্মৃতি এখনো অম্লান ও চিরভাস্বর। আমি দেখেছি, ওই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রায় দু'ঘণ্টা এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতে তাঁকে। যদিও সেই সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা তেমন একটা

ভালো ছিল না। তারপরও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। তাঁর সহজ ও সাবলীল বক্তব্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো হয়ে উঠত খুবই আনন্দময়। এরপর তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। ১৯৯৩ সালের ২০ জুলাই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

১৯৯০ সালে খেলাঘর আসর, অনুসন্ধিৎসু চক্র ও বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলিত উদ্যোগে তাঁকে 'ব্রুনো পদক' প্রদান করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে এই পদকে ভূষিত করা হয়। এই পদকই ছিল তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। ষোড়শ শতকের ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনোর সম্মানে এই পদক প্রবর্তন করা হয়। যাঁকে কোপার্নিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক মতবাদ সমর্থন ও প্রচারের অভিযোগে ১৬০০ সালে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। অধ্যাপক আবদুল জব্বারই প্রথম এই ব্রুনো পদক লাভ করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আরেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে এই পদকে ভূষিত করা হয়। আবদুল জব্বার ব্রুনো পদক ছাড়াও ১৯৮০ সালে বিজ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ 'কুদরাত-এ-খুদা স্মৃতি পদক' এবং ১৯৮৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'একুশে পদক' লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

'ব্রুনো পদক' সহ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

বাংলা ভাষায় রচিত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩ প্রমুখের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবদুল জব্বার ঠিক সে রকম স্বপ্ন না দেখলেও তাঁদের লেখা পড়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। আর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আবদুল জব্বারের লেখা বইগুলোই ছিল আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র সম্বল– যে বইগুলো সৃষ্টি করেছিল এক ঝাঁক তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক ও সংগঠক। এখানেই একজন লেখকের লেখক-জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। জ্যোতির্বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল জব্বার বাংলাদেশের আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে চিরকাল জ্বলতে থাকবেন– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

★ *প্রবন্ধকার চিটাগাং ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মডারেটর এবং জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*

ডিশ এন্টেনা ও স্যাটেলাইট রিসিভার

কাজী রিচি ইসলাম

বৈচিত্র্যপ্রিয় মানুষ জন্ম থেকেই সবকিছুতে বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করে আসছে– আর এজন্যই মানুষ করছে নিত্য-নতুন আবিষ্কার। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০) এর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রতি আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। একদিন ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দেখলেন আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায় ওটা বিদ্যুৎ শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭) প্রথম চুম্বক শক্তির সাহায্যে ডায়নামো (জেনারেটর) ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে ১৮৩১ সালে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের কৌশল উদ্ভাবন করেন। তবে টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) বহু প্রকার বস্তু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে শেষ পর্যন্ত বায়ুশূন্য বাল্বে ট্যাংস্টেন তারের ভেতর ইলেকট্রনের প্রবাহ (বিদ্যুৎ) সঞ্চালন করে আলো জ্বালাতে সক্ষম হন।

এটা ছিল ১৮৭৯ সাল। প্রথম দিকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে পাওয়ার গ্রিডে (Power Grid) এর মাধ্যমে সঞ্চালন করে Motion প্রাপ্ততা থেকে শিল্প-কারখানা তাপ আর আলোর জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্য শক্তি হতে বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর ঘটে থাকে। ফসিল-ফুয়েল (কয়লা-প্রাকৃতিক-গ্যাস-তেল) পুড়িয়ে তাপ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি তারপর জেনারেটর-বিদ্যুৎ জেনারেট করে গ্রিড লাইনে সঞ্চালন করা হয়। এছাড়া রয়েছে জলবিদ্যুৎ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর। আট প্রকার শক্তির মধ্যে একমাত্র বিদ্যুৎ শক্তিকেই মেটালিক তার এর মাধ্যমে সঞ্চালন করে ইচ্ছেমতো নানা কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গুগলিয়েলমো মার্কনির (১৮৭৪-১৯৩৭) টেলিগ্রাফ এবং আলেকজেন্ডার গ্রাহামবেল (১৮৪৭-১৯২২) এর টেলিফোন এ দুটো জিনিস আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে আমরা ইলেকট্রনিকস (Electronics) শব্দের সাথে পরিচিত হই। It demonstrated the principle of electronic communication that continues to be the basis of modern Telephone systems. However electricity is also used by electronic devices to transmit information. The first electronic devices were Telegraph & Telephone. At present amazingly small smount of electric energy can run a hand held cellular phone set, calculator etc. for a year an a tiny battery. ইলেকট্রনিক্স ছাড়া আজ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ এবং বিনোদন জগৎটা পুরোপুরি অচল। মুহূর্তে ক্যাশ Back ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তে। আকারে বর্গ সেন্টিমিটার মেমোরি কার্ডে সুরেলা সঙ্গীতের মূর্ছনা, অর্কেস্ট্রা Download করে শোনা যাচ্ছে। Pendrive ওজনে গ্রাম (Gram) কিউট কিউট তার অবয়ব খানি। অসাধারণ ধারণ ক্ষমতা।

ভলিউম ভলিউম লেখালেখির কম্পিউটার কম্পোজ : অতীতের সুখময় স্মৃতিবিজড়িত আলোকচিত্র একের পর ধরে রাখা যায় কিংবা গত শতকে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের ঘটনাবহুল হিস্টোরিক্যাল মুভি... ঐ সবই EDV প্লেয়ার উপভোগ করা যায় স্বাচ্ছন্দ্যে। সবই ইলেকট্রনিক আর নেনোটেকনোলজির Shophisticated অবদান। ফ্যাক্টরগুলো হলো– শব্দ তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ পালস (Pulse) Bit, Byte, লেজার লাইট অ্যালুমিনিয়ামের ফোম Stylus সিগন্যাল প্রভৃতি। আজকের জগৎ ইলেকট্রনিক্সের বাহনে ছুটে যাচ্ছে আমাদের সৌরজগৎ ছেড়ে অন্য সৌরজগতের উদ্দেশ্যে।

সূর্যকিরণ (Sun-rays) পৃথিবীতে পৌঁছায় ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (এক ট্রিলিয়ন = ১ হাজার কোটি) তরঙ্গের (ঢেউ/Waves) এর আকারে। তার বেশির ভাগই মাপে অতি ছোট। এই বিশ্ব-মহাবিশ্বে কোনো কিছুই স্থির অবস্থায় নেই।

জড় বস্তুর সকল কিছুই নিজ নিজ অবস্থানে কম্পমান। নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর... এসবের জলরাশির তরঙ্গ আমরা দেখেছি। এছাড়া মানুষ অনেক ধরনের তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছে। যেগুলো আমাদের দৃষ্টির বাইরে-চোখে দেখা যায় না। সেসব রশ্মির (Rays) আকারে In-a band space to Deep space এ ছড়িয়ে চলছে তো চলছেই।

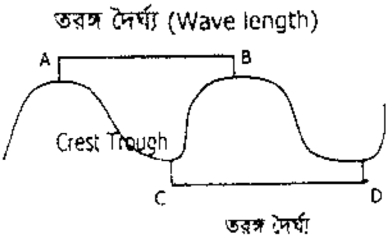

গবেষকরা এদের একত্রে নামকরণ করেছেন Electro magnetic spectrum তারা Experimentally এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-- কোনো চার্জযুক্ত কণা (যেমন একটি ইলেকট্রন) তাড়িত (Under-goes acceleration) হলে পর সেই চার্জযুক্ত কণা (Particle) থেকে Electromagnetic waves বিকিরণ (Radiation) হয়ে থাকে। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিভ ওয়েভ আলোর গতিতে (300000km/Sec) চলে এবং Empty space ও চলাচল করতে পারে।

DIFFERENT WAVES IN SPECTRUM HAVE DIFFERENT FREQUENCIES - 50 they T have different properties.

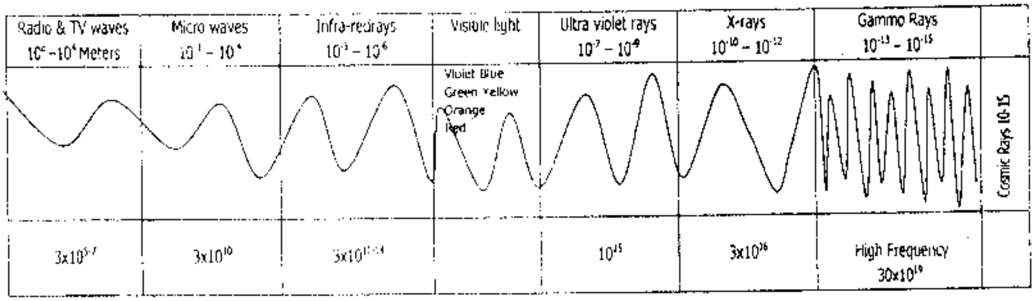

Frequencies (কম্পন মাত্রা) Cycles per seconds

All the different kinds of electro magnetic waves taken together from wath is called the Electro-magnetic spectrum

Gamma Rays	->	for cancer treatments
X-rays	>	Medical Diagnosis
Ultraviolet rays		suntans
Infrared rays	>	warm up
Micro-waves	>	Rader sending signals to Satellites. Cellular phones. And beaming Television & Telephone signals band the country
Radio-TV waves	>	used for communications : Long & medium waves are used for AM Radio VHF waves are used for FM Radio UHF waves are used for Television.

টেলিভিশনে কথা ও ছবি একসাথে দেখা যায়, উপভোগ করা যায়। তাই রেডিও থেকে টেলিভিশনের প্রতি আগ্রহ বেশি মানুষের। আলোক তরঙ্গ বা টিভি সিগন্যাল সরলরেখায় চলে। শর্টওয়েভ বেতার তরঙ্গের ন্যায় পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের (Atomsphere) শেষস্তর আয়নমন্ডল (Tonosphere) এ প্রতিফলিত হয় না।

পৃথিবীর উপরিতল/ পৃষ্ঠ অসমতল এবং গোলাকার বলে TV স্টেশন থেকে টেলিকাস্ট করা টিভি সিগন্যাল কিছুদূর গিয়েই মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। বেশি হলে ১২৮ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত টিভি সিগন্যাল রিসিভ করা যায়। এর বেশি দূরত্বে টিভি সিগন্যাল রিসিভ করার জন্য প্রয়োজন হয় বুস্টার বা শক্তিশালী টিভি এন্টেনা। এন্টেনা এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটির কাজ হলো Electro-megnetic wave কে শূন্যে বিকিরণ করা এবং শূন্য থেকে গ্রহণ করা। কিন্তু তাও একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাজ করে। এ প্রক্রিয়ায় ৮০ কিলোমিটার দূরত্বে টিভি সিগন্যাল প্রেরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় রিলে স্টেশনের।

মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ SPUTNIK এক রাশিয়া মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে ০৪ অক্টোবর ১৯৫৭ তারিখে। সেই থেকে বিজ্ঞানীগণ উপগ্রহের (Satellite) মাধ্যমে টিভি সিগন্যাল প্রেরণের চিন্তা-ভাবনা করেন। কারণ এ পদ্ধতিতে পাঠান টিভি সিগন্যাল সরাসরি পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়বে এবং উপর থেকে কোনোরূপ বাধা না থাকায় টিভি সিগন্যালের মানও অপরিবর্তিত থাকবে। একটি টর্চলাইটের আলো যেরূপ উৎস থেকে যতদূর যায় ততো বিস্তার লাভ করে। সেভাবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা পৃথিবীর উপরিতলের ৬০ ভাগ এলাকা সিগন্যাল কভার করা এবং এ পদ্ধতিতে মাত্র তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে টিভি সিগন্যালের আওতায় আনা যায়।

বহু বছর পর্যন্ত মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ স্যাটেলাইটগুলো পরাশক্তিগুলোর সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে ছিল। বর্তমানে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এদের মধ্যে আমেরিকান কোম্পানি CNN (Cable News Network) প্রথম ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে থেকে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে। বর্তমানে আমাদের দেশে S. T. A. R (Satellite Tevision for Asian Region) TV'র অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে। STAR TV ৮টি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেলে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। STAR TV চ্যানেলগুলো হলো প্রাইম স্পোর্টস, MTV, স্টার প্লাস, BBC, জিটিভি, পিটিভ, স্টার চায়না ও স্টার মায়ানমার। STAR টিভি যে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে তার নাম EKRAN. অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের সাথে চুক্তি হয়েছে– সে অনুসারে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ করা হবে। এজন্য রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন সিস্টেম কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে তার নাম EKRAN. অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের সাথে চুক্তি হয়েছে– সে অনুসারে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ করা হবে। এজন্য রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন সিস্টেম কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে ৩৫ হাজার ৮০০ কিলোমিটার উপর অবস্থান করে সরাসরি পৃথিবীতে সিগন্যাল প্রেরণ করে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে অনেক দূরত্বের অবস্থানের জন্য পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটে রিসিভ এবং স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীতে সিগন্যাল 'রিসিভ'-এর জন্য Super High Frequency ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

★ *প্রবন্ধকার একজন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখিকা।*

সবজি, ফল-ফলাদি কেনার সময় সাবধান থাকুন

কৃষিবিদ আলী আকবর

দেশটা যে আর বসবাসের যোগ্য নেই এমন আহাজারি সাধারণজনের মুখে আমরা অহরহই শুনি। নিত্যদিনকার পত্রিকার খবর পড়লে সে আহাজারির যৌক্তিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হত্যা, খুন, রাহাজানি ইত্যাকার নানা রকম অনাচার তো আছেই। রাজনীতির বিষাক্ত থাবায় অতিষ্ঠ জনজীবন এবং এসব থেকে কোনোরকমে রেহাই পেলেও সুস্থস্বাভাবিকভাবে বাঁচার কোনো উপায় নেই। খাবারের নামে বিষ খেয়ে আপনাকে মরতে হবে, নয়তো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে হবে। এর আগে বিভিন্ন ফলফলাদিতে কীটনাশক ও নানা রাসায়নিক প্রয়োগের খবর আমরা শুনেছি। নিত্যকার সবজিও রাসায়নিক বিষাক্ত থাবার বাহিরে নয়।

বড় বড় লাল ও শক্ত টমেটো

জনগণ কী খাচ্ছে সবজি না বিষ?

রাজধানীর বাজারগুলো থেকে যে বড় বড় লাল ও শক্ত ধরনের টমেটো কিনে লোকজন খাচ্ছে, এগুলো আসলে কী– সবজি না বিষ? বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০ টন টমেটো আসে ঢাকায় এবং বিক্রি হয় বিভিন্ন বাজারে। এই টমেটো বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাকানো। জনগণ কি তবে এই বিষাক্ত টমেটোই খাচ্ছে না? বৃহত্তর রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে যে টমেটো চাষ হচ্ছে তা হরমোন দিয়ে আকারে বড় করা হচ্ছে, কাঁচা অবস্থায় গাছ থেকে জড়ো করে রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করা হচ্ছে এই টমেটোতে। খোলা সড়কের পাশে প্রকাশ্যেই এই কাজটি ঘটছে এবং পত্রিকায় ছবিও ছাপা হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করার ফলে এই টমেটো টকটকে লাল হয় এবং শক্ত থাকে, নরম হয়ে যায় না। রঙে মুগ্ধ হয়ে ক্রেতারা বাজার থেকে এই টমেটো কিনছে। কিন্তু এই টমেটো খাওয়ার ফল কী হতে পারে সে ব্যাপারে কি ক্রেতারা সচেতন?

বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন তা এক কথায় ভয়াবহ। দীর্ঘদিন এই টমেটো খেলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, কেমিক্যালের ক্ষতিকর উপাদান সরাসরি পাকস্থলীতে যাওয়ায় নানা ধরনের মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিতে পারে এবং তা কয়েক প্রজন্ম ধরেও চলতে পারে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে আসাসহ স্নায়ুরোগও হতে পারে। আর কৃত্রিম উপায়ে পাকানো সবজিতে কোনো পুষ্টিগুণও থাকে না। ক্রেতারা জেনে বা না জেনে বিষ কিনে খাচ্ছে বা খেতে বাধ্য হচ্ছে। মুনাফালোভী কিছু ব্যবসায়ীর এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল হতে পারে বিপর্যয়কর। সচেতন ক্রেতারা টমেটো খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। আর শুধু টমেটোই নয়, শাকসবজি ও ফলমূলে হরমোন ও বিষ প্রয়োগ হচ্ছে– পাকানো, পচন ঠেকানো, তরতাজা দেখিয়ে বিক্রি করার জন্য।

কাঁচা টমেটো দ্রুত বড় করে পাকানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে!

টমেটো খুচরা ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে রান্নাঘর হয়ে চলে যাচ্ছে খাবার টেবিলে, সেখান থেকে মানুষের পেটে। কিন্তু রাজধানীবাসী কি জানেন, বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে এই সবজিটিকে আকারে বড় করা হয়েছে! এর গায়ের টকটকে লাল রঙটি 'বিষ'! লক্ষ কোটি মানুষকে এই ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে গুটিকয়েক ব্যবসায়ী। জানা গেছে, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর, নওগাঁর নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর এবং বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েক বছর ধরে উন্নত জাতের টমেটো চাষ হচ্ছে।

রাজধানীর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এ অঞ্চলের চাষিরা টমেটো চাষের দিকে ঝোঁকেন। এই সুযোগে মুনাফালোভী একটি মহল টমেটো ও টমেটো গাছে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার শুরু করে। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কৃত্রিমভাবে রঙিন করা খাবার, ফল বা শাকসবজি খেলে মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এসব খাবার খেলে ক্যান্সার ছাড়াও বিভিন্ন জটিল অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের টমেটো ঢাকায় যায়।

উত্তরাঞ্চলের বসন্তপুর, গোপালপুর, কুসুন্দা, হাবাসপুর, ভডিসপুর, কানাইডাঙ্গাসহ আরও কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সকালে ক্ষেত থেকে কাঁচা টমেটো তুলে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের পাশে প্রথমে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর শুরু হয় কেমিক্যাল দেওয়া। দেখা গেছে, এক বালতি পানিতে ৫০ মিলিলিটার কেমিক্যাল মিশিয়ে তা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে কাঁচা টমেটোর ওপর ছিটানো হয়। এরপর এই কেমিক্যাল শুকানোর জন্য দেওয়া হয় এক ধরনের ড্রাইওয়াশ।

ওষুধের টমেটোর বৃদ্ধি : আম বাগান বিক্রির মতো টমেটো ক্ষেতও আগাম বিক্রি হয়। ব্যবসায়ীরা তা এক মৌসুমের জন্য কেনেন। তারা টমেটো ধরার আগেই গাছে নানা ধরনের উদ্দীপক হরমোন ব্যবহার করে

থাকেন। ব্যবসায়ীরা টমেটো দ্রুত বড় করার জন্য 'প্যান্ট্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর' জাতীয় কেমিক্যাল ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ইথারেল নামের এক জাতীয় দ্রুত বর্ধনশীল কেমিক্যালের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

পচন ঠেকাতে বিষ : গোদাগাড়ী অঞ্চলে টমেটোর পচন ঠেকাতে তারা দীর্ঘদিন ধরেই ডাইথেন-এম-৪৫, টিল্ট ও ফাংগিসাইট নামের কয়েকটি ভারতীয় কেমিক্যাল ব্যবহার করে আসছেন। এতে টমেটো পাকার পরও এক থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত শক্ত থাকে। জানা গেছে, ইথিনাল জাতীয় ইডেন, টমটম, রাইপেন ও প্রফিট নামের চারটি ওষুধ দিয়ে তিন দিনের মধ্যে কাঁচা টমেটো পাকানো যায়। মাত্রা বেশি দিলে এমনকি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই টমেটো লাল টকটকে পাকানো যায়। মূলত ভারত থেকে এসব কেমিক্যাল চোরাই পথে আসে। বাংলাদেশি বিভিন্ন এগ্রোকেমিক্যাল কোম্পানিও এসব সরবরাহ করে থাকে। এ ধরনের কেমিক্যাল বিক্রির প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে রাজশাহীর গোদাগাড়ীসহ আশপাশের এলাকায়। জানা গেছে, ১০০ মিলিমিটারের এক বোতল রাইপেন দিয়ে ১ টন টমেটো পাকানো যায়।

কেন এই বিষ-ব্যবসা : ব্যবসায়ী আতিকুর রহমান জানান, তারা এই টমেটো চালান করেন ঢাকা কারওয়ান বাজারের আড়তে। এই অসাধু কর্মকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা বলেন, বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। ঢাকায় ব্যবসায়ীদের হাতে রাখার জন্য সব চালান ব্যাপারীই কয়েক বছর ধরে এসব করছেন। ব্যাপারীরা বলেন, ঢাকার লোকজন লাল টকটকে ও শক্ত টমেটো পছন্দ করেন। আর রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এক কেজি টমেটোর দাম ১৫ টাকা হলেও ঢাকায় তা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ব্যাপারীরা জানান, স্থানীয় বাজারে বিক্রয়যোগ্য টমেটো তো তারা রঙ দেন না।

বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের কৃষিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ড. গোলাম কবীর জানান, কেমিক্যালের ক্ষতিকর উপাদান মানুষের পাকস্থলীতে সরাসরি যায়। ফলে একটা পর্যায়ে মানুষ মারাত্মক সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এসবের ক্ষতিকর প্রবাহ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত চলতে পারে বলেও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ড. কবীর আরও বলেন, কৃত্রিম উপায়ে পাকানো সবজিতে কোনো পুষ্টি থাকে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রণজিত কুমার সাহা বলেন, রঙ মেশানো ফলমূল, সবজি দীর্ঘদিন খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। সেই সঙ্গে স্নায়ুরোগসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগ হতে পারে। তিনি বলেন, এখনই এসব না ঠেকানো গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

★ *প্রবন্ধকার একজন কৃষিবিদ।*

কোয়ান্টাম পথের কথা

সৌমেন সাহা

বিশ শতকের পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে নানা মৌলিক স্তম্ভের নির্মাতা নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, হেলমুলৎজ ও লরেঞ্জের কথা বাদ দিয়ে আলোচনা চলে না। ফ্যারাডে আর এডিসনের অবিশ্বাস্য উদ্ভাবনার কথাও আমাদের চিন্তায় এসে যায়। তবে সব ভাবনা ছাড়িয়ে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাজ পদার্থবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ বেঁধে দেয়। পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান ভাবনা পদার্থ ও শক্তি নিয়েই। পদার্থ আবার কণা দিয়ে তৈরি— ছোটি কণা, বড় কণা। শুধু কণা বললে আকারের আন্দাজ পাওয়া যায় না। অণু আর পরমাণুর ধারণা এলো। ডাল্টন, অ্যাভোগ্যাড্রো বড় মাপের কাজ করলেন এই নিয়ে। ১৮৯৭ সালে থমসনের হাতে ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারে পরমাণুর প্রথম ভাঙন ঘটল। জানা হলো 'ইলেকট্রন' এর কথা। থমসনের ছাত্র রাদারফোর্ড জানালেন 'নিউক্লিয়াস' আর প্রোটনের কথা। রাদারফোর্ডের ছাত্র স্যাডউইক জানালেন নিউট্রনের কথা। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন— এই ত্রয়ী চরিত্রের কথা জানতে আমাদের ১৮৯৭ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সময় লেগেছে। এমন করে যখন চলছিল পরমাণু উন্মোচনের কাজ, তখন জার্মানির মাটিতে অন্যরকমের ভাবনায় ডুবে ছিলেন এক বিজ্ঞানী। তিনি ম্যাক্স প্লাঙ্ক।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক

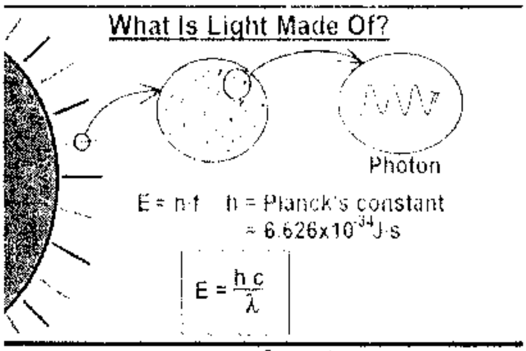

'আলো'র অন্য নাম 'তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ' বা 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন'

"আলো কী?" এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতরে দু'রকমের মত ছিল। একদল বলতেন, আলো এক রকমের কণা। এই মতের জোরদার সমর্থক নিউটন। আরেক দল বলতেন, কণা কেন হবে, আলো এক রকমের ঢেউ। কারও কারও কাছে আলো 'কণা'। কারও কারও কাছে আলো 'ঢেউ'। এর বাইরে ভাবতে পারছেন না কেউই। একটা সময় ম্যাক্সওয়েল এলেন। 'কণা' আর 'ঢেউ' এর দ্বন্দ্বে যোগ দিলেন, বললেন সোজা করে। আলো 'ঢেউ' ছাড়া কিছুই নয়। এমন এক 'ঢেউ' যার ভেতর চৌম্বক ও তড়িৎ দুই চরিত্রই রয়েছে। এমন না বললে এবং সত্যি না হলে 'আলো'র অন্য নাম 'তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ' বা 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন' হতো না।

কুচকুচে কালো বস্তুর আলো শোষণ ও বিকিরণ নিয়ে কাজ করছিলেন অনেকেই। কারশভ, স্টেফান, ভিয়েন, লর্ড র‍্যালে— এ চারজনের কথা তো বলতেই হয়। কারশভের কাজ বিশ শতকের পূর্ব কাজ। তবু বলতে আমাদের হবেই। বলা নেই কওয়া নেই— দুম করে কাছে চলে যাওয়া যায় না। কারশভও জার্মানি বিজ্ঞানী

ছিলেন। বর্ণালী বিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮২৪ সালে জন্ম। বাষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন। কনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। ব্রেসলো ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কলেজে 'কারশভের সূত্র' পড়তেই হয়। কবে লিখেছিলেন কারশভ, এই সূত্র? ১৮৪৫ সালে। হ্যাঁ, তখনও তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। বয়স একুশ বছর। আমরা তড়িৎবিজ্ঞানে 'ওহমের সূত্র' সবাই পড়েছি। কারশভের সূত্র ওহমের না বলা কথার পদ সম্পূরক করেছে। রসায়নবিদ বুনসেনের আজীবন সঙ্গী ছিলেন কারশভ। দুজনে মিলে বর্ণালীবিজ্ঞানের কতো অজানা পৃথিবী যে আবিষ্কার করেছেন, তা ভাবাই যায় না। শিখা তৈরির ভার বুনসেনের হাতে। বর্ণালীযন্ত্র তৈরির ভার কারশভের হাতে। বর্ণালীযন্ত্র বানাতে 'প্রিজম' লাগে। সেই 'প্রিজম' কারশভ নিজেই তৈরি করে নিতেন। সরাসরি এবার আমরা 'কারশভের বিকিরণ সূত্র'– এর কথায় চলে যাই। কী এই সূত্র? বলেছেন কারশভ, একই তাপমাত্রায় নানা বস্তুর শোষণ ও বিকিরণ ক্ষমতার অনুপাত সমান। এই ধারণাকে মূল ভিত্তি করে এক সময় তিনি স্পষ্টভাবে 'ব্ল্যাক বডি' বা কৃষ্ণবস্তুর ধারণা দিতে পারলেন।

য়োসেফ স্টেফান (১৮৩৫-৯৩) ছিলেন অস্ট্রিয় পদার্থবিদ। ভিয়েনায় পড়াশোনা শেষ করে সাত বছর স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। অবসর পেতেন যখন গবেষণা করতেন। ১৮৬৩ সালে স্কুল ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানেই গবেষণা ও অধ্যাপনা জীবন কাটান। পরীক্ষার হাত খুব ভালো ছিল। ১৮৭৯ সাল। নিউটনের এক সূত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল তাঁর মনে। খুবই উত্তপ্ত কোনো বস্তু যে হারে তাপ বিকিরণ করে, স্টেফানের মনে হলো হারের মাত্রা তার চেয়ে বেশি হবে। নিউটনকে সন্দেহ? ভুল হলে কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। পরীক্ষার হাত ভালো, পরীক্ষা সাজালেন। দেখিয়ে দিলেন, নিউটন ঠিক ছিলেন না। ব্যাস, এইটুকুনই।

জর্জ স্টেফ্যানসন

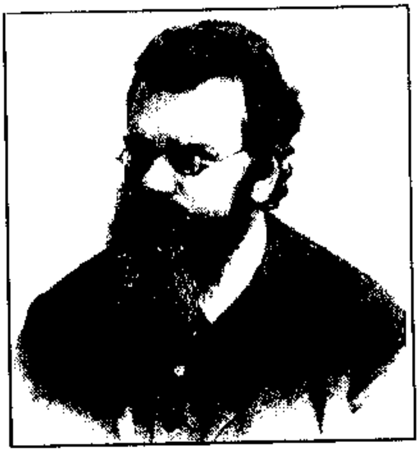

বোলৎজম্যান

স্টেফানের প্রিয় ছাত্র বোলৎজম্যান। নামটা লিখতে গেলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। এমন প্রতিভা কেন আত্মহত্যাকারীদের তালিকায় নিজের নাম যোগ করেন, আমরা বুঝতে পারি না। বড় কাজ করতে গিয়ে কে না নিন্দিত হয়েছেন সময়কালে? ইতিহাস পড়ে তাঁদের যাচাই করে নিয়েছে। আদর ও ভালোবাসায় বুকে টেনেছে। নয়তো জঞ্জাল বলে দূরে ঠেলে দিয়েছে। যাই হোক, বোলৎজম্যান, শিক্ষক স্টেফানের কাজটিকে

আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছিলেন। এখানে একক ক্ষেত্রফলে তাপ বর্জনের পরিমাণকে 'j' ধরা হয়েছে। 'σ' এক ধরনের ধ্রুবক, যাকে আমরা 'স্টেফানের ধ্রুবক' বলে জানি। আর জটিলতায় যাচ্ছি না। ছাত্র বোলৎজম্যান মাস্টার মশাইয়ের সূত্রটিকে পৃথিবীতে স্থায়ী আসন দিয়ে যেতে চান। কাজ করছিলেন সেটি নিয়েই। দেখতে পেলেন, একটি পরিশুদ্ধরূপ দেখা যায়। কী সেই রূপ? স্টেফানের সূত্র তখনই একশোভাগ সত্যি হয়, যখন একটি তপ্ত বস্তু থেকে ছোটবড় সব রকমের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিকীর্ণ হয়। কখন হয় এমন? বস্তুটি যদি 'কৃষ্ণবস্তু' বা 'ব্ল্যাক বডি' হয় তবেই এমনটি ঘটে। আমরা দেখেছি, 'কালো' আর অবহেলিত থাকছে না। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের মূল আঙিনায় 'কৃষ্ণবস্তু' ঠাঁই করে নিচ্ছে। স্টেফানের সূত্রকে এখন তাই 'স্টেফান বোলৎজম্যান' সূত্র বলা হয়। ছাত্র যখন বড় মাপের কাজ করে, মাস্টার মশাইয়ের চেয়ে কে বেশি খুশি হন? স্টেফান দেখেছিলেন, বোলৎজম্যানের কোনো তুলনা হয় না। কেন? এই সংশোধন ব্যবহার করে তিনি সূর্যের উপর পিঠের তাপমাত্রা যে ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সে জিনিস মাপতে পেরেছিলেন।

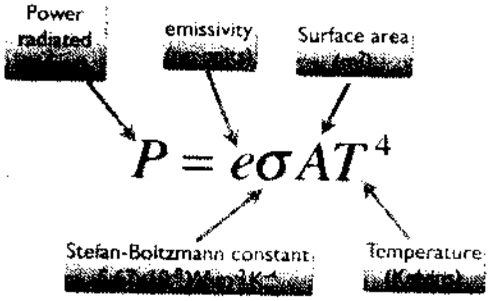

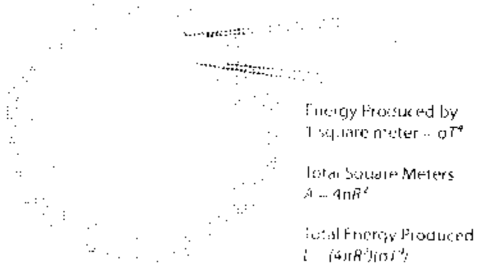

'স্টেফান বোলৎজম্যান' সূত্র। স্টেফান দেখেছিলেন, এই সূত্র ব্যবহার করে তিনি সূর্যের উপর পিঠের তাপমাত্রা যে ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সে জিনিস মাপতে পেরেছিলেন।

এবার আমরা ভিয়েনের অবদান দেখে নেব। সবাই উনিশ শতকের চরিত্র। ভিয়েন ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। প্লাঙ্কের চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিলেন, 'কৃষ্ণবস্তু'র নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে কোথাও যাননি। এমন কাজ তাঁর, যার কথা মনে রেখেই প্লাঙ্কের ঐতিহাসিক অবদান নির্মিত হয়। জমি জমা রয়েছে এমন ঘরে ভিয়েনের জন্ম হয়। ইচ্ছে ছিল, জমি জায়গার কাজই দেখাশোনা করবেন। কারও সব ইচ্ছে পূরণ হয় না কখনও, তাঁরও হয়নি। পড়তে গিয়ে লেখাপড়ার কাজটিই ভালো লেগে যায়। গটিনগেনে কিছুকাল পড়েছেন। পরে বার্লিন থেকে স্নাতক হওয়ার ডিগ্রি নেন। বার্লিনেই গবেষণা করে ডক্টরেট পান। আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে কাজ। ঘরে ফিরে জমিজমাই দেখছিলেন। একবার ভয়ানক খরা নেমে এলে জমিজমার একটু-আধটু ফসলেরও দেখা মেলে না। আর নয়। জমি সব বেচে দিলেন। বার্লিনে এসে বিজ্ঞানী হেলমুলৎজ-এর কাজে সহযোগী পদে যোগ দেন। ভুর্জবার্গে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালে যোগ দিয়ে সেখানেই ছিলেন। এক্স-রশ্মি আবিস্কর্তা রনজেনও ভুর্জবার্গেই ছিলেন একসময়। তাঁর জায়গায় এলেন ভিয়েন। ভিয়েনের কাজ যদি না বুঝি, প্লাঙ্ককে বুঝতে পারব না। আগে আমরা দেখিয়েছিলাম স্টেফানের সূত্র, ভিয়েন ওরকম করে বললেন না। বললেন আরও একটু সহজ করে। তাঁর হিসেবে যেকোনো কৃষ্ণবস্তুর বেলায় λT = 0.29 লেখা যায়। মানে দাঁড়ালো কী? 'λ' বলতে আমরা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বুঝি। কেমন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য? যে দৈর্ঘ্য থাকলে 'T' তাপমাত্রায় একটি কালো বস্তু সবচেয়ে বেশি শক্তি খরচ করে।

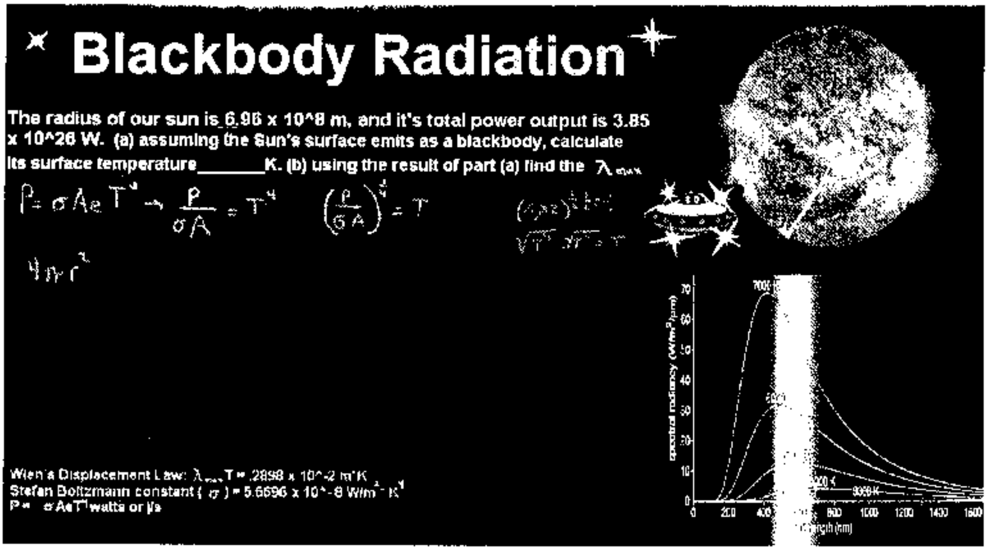

এমন সূত্রের একটি নাম রয়েছে [illegible] ভিয়েনের প্রতিস্থাপন সূত্র। এই সূত্র আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, একটি [illegible] যদি আরও গরম করা যায়, বিকিরণের বেলায় যে তার ছড়িয়ে [illegible] একটা স্বর্গীয় সাদা হয়ে উঠবে। কেন? সবচেয়ে বেশি বিকিরণ যে তরঙ্গ [illegible] দিয়ে চোখে দেখা বর্ণালীর মাঝামাঝি চলে আসবে।

১৮৯৬ সাল। ভিয়েন [illegible] কথা ভাবলেন। একদিকে থাকবে বিকিরণ বর্ণালীর ধরন ধারণ, অন্যদিকে [illegible]। কখন এমন ভাবতে পারা যায়? যখন গরম ঐ বস্তুটিকে আমরা [illegible] ভাববো। এ ক্ষুদে দোলকগুলো এমনই যে, এরা যেকোনো কম্পাঙ্কের বিকিরণ [illegible] ভালো। তবে একটি খামতি থেকে গেল। ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেলায় এ সূত্রের [illegible] ফলাফল থেকে খানিকটা পিছলে যায়। এমন কাজ করেছেন কি কেউ, [illegible] সূত্রটি চমৎকার অথচ ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলে গলিয়ে বেরিয়ে আসে? হ্যাঁ, [illegible] নাম জন উইলিয়াম স্ট্রাট (১৮৪২-১৯১৯)। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্ট্রাট শব্দ আলো ও বিদ্যুৎ [illegible] সব কাজ করেছেন তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা সাড়ে চারশোর কাছাকাছি। আমরা [illegible] বিদ্যুতের কাজ নিয়ে কোনো কথা বলবো না। শুধু আলোর কাজ দেখতে চাইবো। [illegible] কেমব্রিজের সর্বময় কর্তার কাজ পেয়েও গোড়ায় ব'র দুই নিষেধ করলেন। পরে [illegible] কথা দিলেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা পদার্থবিদ ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় [illegible] মাথাব্যথা নেই কতো ছাত্র নিয়ে কাজ করিয়েছেন তিনি, জানলে বিস্ময় জাগে। এমন [illegible] ছাত্র এক সাথে তাঁর ল্যাবে কাজ করেছে। বিকিরণ নিয়ে কাজ করে যা বলতে চাইলেন [illegible] আলোর বেলায় ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার সেরা কাজ।

ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেলায় ভিয়েন [illegible], বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেলায় র‍্যালে সত্যি, এমনটি না হলে কি ভালো হতো না? ছোটবড় এমন [illegible] উঠবে না, একটি সাধারণ সূত্র দুই বেলাতেই খাপ খেয়ে যাবে। প্ল্যাঙ্ক দেখালেন প্রথম আমাদের [illegible] আমরা গলদ করে বসে রয়েছি। আলোকে যদি 'ঢেউ' বলে ধরা হয়,

[illegible] একটি নীতিগল্প আমরা ছোটবেলায় সবাই পড়েছি। [illegible] নিজেদের মধ্যে মারামারি [illegible] মারা যাওয়ার মুখে বোধ হয় ছেলেদের বোঝাতে পেরেছিলেন, নিজেদের মধ্যে মারামারির [illegible] বাইরের শত্রু সহজে ঢুকে পড়ে। এক হয়ে থাকো, শত্রু কিছুতেই [illegible] করতে পারবে না। [illegible] ভিজেছিল? এক বান্ডিল পাটকাঠি দিয়ে কথাটি ছেলেদের বোঝাতে হয়েছিল। [illegible] করে ভেঙে যায়। একগুচ্ছ পাটকাঠি একসাথে নিলে [illegible] হয় না। [illegible] তেমন পাটকাঠির বান্ডিলের মতো। এই এক একটি [illegible] নাম দেওয়া হয় কোয়ান্টাম।

প্লাঙ্কের জীবনকথা (১৮৫৮–১৯৪৭) এই সুযোগে [illegible] বাবা তার ছিলেন 'নগর আইন' বিষয়ের অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল। বার্লিন ও মিউনিখ এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। ১৮৭৯ সালে ডক্টরেট লাভ করলেন। [illegible] সালে কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৮৮৯ সালে বার্লিনে চলে এলেন। বার্লিনের ঐ পদে ছিলেন কারশফ। কারশফ মারা যাওয়ার পর বোলৎজম্যান [illegible] তিনি রাজি হলেন না। [illegible] হাইনরিখ হার্ৎজ আমন্ত্রিত হলেন। তিনিও রাজি হলেন না। প্লাঙ্ক কর্তাব্যক্তিদের প্রথম পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। বোলৎজম্যান আর হার্ৎজ রাজি না হওয়ায় প্লাঙ্কের সুযোগ ঘটেছিল। তবে পুরো অধ্যাপকের পদ দেওয়া হলো না। সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে প্লাঙ্ক যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য বেশিদিন কর্তাব্যক্তিরা [illegible] পাননি। অল্পদিন পরে প্লাঙ্ক পূর্ণ অধ্যাপক পদে থেকেই কাজ করেছেন।

ঠিক কবে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম [illegible] বিজ্ঞান সন-তারিখ ধরে হঠাৎ তৈরি হয় না। [illegible] একসময় বুনন হয় আর অসামান্য ফসল ফলে। [illegible] ১৯০০। [illegible] প্লাঙ্ককে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, [illegible] প্লাঙ্কের কাছে পেশ করেন। প্লাঙ্ক ঐ রাতেই বসে গেলেন [illegible] লিখে পাঠালেন। কবে? সেই সন্ধ্যাতেই। ঠিক [illegible] ১৯০০ অক্টোবর [illegible] প্লাঙ্ক তাঁর যাবতীয় ভাবনা পেশ করেন। [illegible] দুনিয়ার পদার্থবিজ্ঞান [illegible] বদলে দিল।

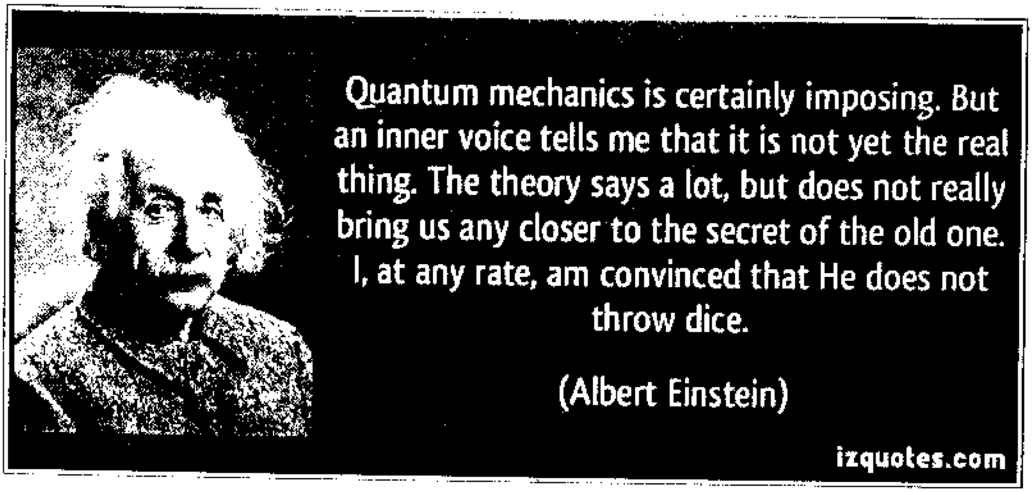

উঠে এলেন আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে আলোক তড়িৎ তত্ত্বের পরীক্ষা করে প্লাঙ্কের সত্যতা ঘোষণা করলেন। পরমাণুর গঠন যেখানে রাদারফোর্ডের হাতেও পুরোপুরি ব্যাখ্যা হচ্ছিল না, ডেনমার্কের তরুণ মেধাবী বিজ্ঞানী নীলস বোর এসে প্লাঙ্কের ধারণা নিয়েই চমৎকার পরমাণুকে ব্যাখ্যা করেন। 'ব্যাখ্যা' বললেই দায়িত্ব সেরে যায় না। এমন যুগান্তকারী এসব কাজ, আইনস্টাইনকে নোবেল দিতে হয়। বোরকে নোবেল দিতে হয়। আগের বছর ও তার পরের বছর। প্লাঙ্ক নিজেও ১৯১৯ সালে নোবেল পেয়েছিলেন। ভিয়েন, র‍্যালে এঁরাও নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন। ১৮৫৯ সালে কারশভের কাজ দিয়ে 'কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ' ভাবনা শুরু হয়েছিল। প্লাঙ্কের হাতে সেই ভাবনা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। ১৮৫৯ সালে ১৯২৬ পর্যন্ত এ ভাবনা পদার্থবিদ্যার অন্যতম অভিজাত ভাবনা হিসেবে বিজ্ঞানীদের মহলে জায়গা করে নিয়েছিল।

মজার বিষয়, গোড়ায় আইনস্টাইন প্লাঙ্কের কাজ দেখে খুব উৎসাহ বোধ করেননি। ধীরে ধীরে তিনি এ ভাবনায় মুগ্ধ হয়েছেন। এতোটাই মুগ্ধ, ১৯১৮ সালে প্লাঙ্কের নাম তিনি নোবেল দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। পরের বছর প্লাঙ্ক নোবেল পান। এমনই ঘটল যে, আরও দিগদর্শনকারী কাজের স্রষ্টা হয়েও আইনস্টাইন প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সপ্রমাণ পরীক্ষার জন্যই নোবেল পেয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল দুজনার। ১৯৩০ সালে আইনস্টাইন আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর তখনই জর্মানিতে ফিরতে চেয়েছেন আইনস্টাইন। প্লাঙ্ক বারণ করেছেন। হিটলারের তান্ডব থেকে আইনস্টাইন সেদিন রেহাই পেতেন না। নিজে একটার পর একটা ঝড় সামলেছেন প্লাঙ্ক, স্বজনদের পর পর চোখের সামনে চিরকালের মতো চলে যেতে দেখেছেন। এক ছেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়। দুই যমজ সন্তান আঁতুড় ঘরেই সেসময় মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যু নির্মম ইতিহাস রচনা করেছে। প্রবীণ পিতার সামনে ছেলেকে খুন করে কুখ্যাত নাৎসি দল। অপরাধ কী তার? হিটলারকে খুন করার ছক কষছিল যে ক'জন লোক সেদিন জার্মানিতে, তিনি নাকি তাঁদের একজন ছিলেন। প্রমাণিত হয়নি যদিও, সন্দেহ হলেই বা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কেন? সরিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। এমন শোকেও পাথর হয়ে যাননি। পৃথিবীর চৈতন্যের প্রতিরূপ ছিলেন। বিজ্ঞানের কাজ নিরলসভাবে করে গিয়েছেন। ১৯৩০ সালে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাইজার ভিলহেলেম ইনস্টিটিউটের সভাপতি পদে যোগ দিয়েছিলেন। হিটলারও তখনই ক্ষমতায় এসেছেন। ভাবছিলেন, বিজ্ঞান করে যাবেন বিনা বাধায়। এই গবেষণাকেন্দ্রগুলোকে আপন মনের মাধুরীতে সাজাবেন। কোথায় কী। নাৎসিদের হুকুমে বিজ্ঞান চলবে। ছেড়ে দিলেন সভাপতির পদ। সে ১৯৩৭ সালের কথা। প্রতিবাদ জানিয়ে ছাড়লেন। কী প্রতিবাদ? ইহুদি বিজ্ঞানীদের উপর যা লাঞ্ছনা হচ্ছে দিনের পর দিন, এ কোনো সভ্য সমাজে চলতে পারে না। কিছুদিন হলো এই ইনস্টিটিউটের ভেতর অল্প কিছু বিজ্ঞানীও কেমন বিকৃত বাসনার ছিলেন, তার ইতিহাস প্রকাশিত হচ্ছে। নাৎসি পরবর্তী জার্মানি তাঁকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর শিরোপা দিয়েছে। সারা দেশের নানা বিষয়ের অগ্রণী গবেষণাগারগুলো এখন 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট' নামে পরিচিত।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব পৃথিবীর চেহারাটাকেই পাল্টে দিয়েছে। একগুচ্ছ তরুণ বিজ্ঞানী তাকে আশ্রয় করে অন্য ভাবনা বিকশিত করেছেন, নতুন ভাবনা তৈরি করেছেন। ধ্রুপদী কোয়ান্টাম তত্ত্ব না থাকলে আজকের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তৈরি হতো না। দ্য ব্রগলি, হাইজেনবার্গ, শ্রয়ডিঙ্গার, ডিরাক, ফেইনম্যান এঁরাও কেউ এমন করে উঠে আসতেন না। মেধার লড়াইও চলত না। 'কোপেনহেগেন' আজ যা বলছে, আইনস্টাইন সবটা মেনে নিতে পারছেন না। কোপেনহেগেন বলতে যে সেসময় নীলস বোরের গবেষণাকেন্দ্রকেই বোঝাত, আজ সবাই জানেন।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লিও লেডারম্যান। ফার্মি ল্যাবের অধিকর্তা। সোজাসুজি বলেছেন, দেশের শতকরা পঁচিশ ভাগেরও বেশি জাতীয় উৎপাদন যে প্রযুক্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই প্রযুক্তি কোয়ান্টাম ভাবনা জন্ম না

নিজে তৈরিই হতো না। খুব চমৎকার একটি বই লিখেছেন লেডারম্যান– 'The God Particle'। মজা করে বলেছেন, যদি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই কোনোকিছুর জবাব হয় তবে প্রশ্নটা কোথায় থাকে?

সম্প্রতি প্রয়াত অসামান্য জীবনীকার অব্রাহম পেইজ তাঁর আইনস্টাইনের জীবন নিয়ে লেখা বইতে 'রুবেন্স-প্লাঙ্ক' কাহিনির বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসে ঘটনাটা যেমন করে রয়েছে, তাই এইরকম। ১৯০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভায় তপ্ত বস্তুর তাপ বিকিরণ নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন বিয়াল্লিশ বছরের যুবক ম্যাক্স প্লাঙ্ক। মাস দুই আগে এই ভাবনাকেন্দ্রিক একটি সমীকরণ তিনি গবেষণাপত্রে প্রকাশ করেছেন। সমীকরণের প্রমাণ চাইতো! পরীক্ষামূলক প্রমাণ। মনে হলো, এখন প্লাঙ্ক সেই প্রমাণ নিয়ে বলার মতো অবস্থায় এসেছেন। আগে বলেছি, ছোট ছোট কণার ধারণা বললেন তিনি। একগুচ্ছ দোলক দিয়ে যেন তৈরি সেসব কণা। সমীকরণ যা দাঁড়ালো, এর চেয়ে ছোট আর কী হয়? $E = h\lambda$; E বলতে আমরা শক্তি বুঝি। h হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক। λ বলতে বিকিরিত শক্তির কম্পাঙ্ক বোঝায়। এমনই দেখতে, আরও এক মহাশক্তিধর সমীকরণ $P = mf$, যা তৈরি করে গিয়েছেন নিউটন। ছোট্ট কথা। ব্যঞ্জনার সীমা ছোঁয়া যায় না।

পৃথিবীর সর্বজনমান্য ভৌত রসায়নবিদ ভাল্টার নার্নেস্ট। পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিয়ে বলতে গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পুরোপুরি কাজে লাগালেন। বিজ্ঞানে এখনও বোধ হয় সবসেরা সম্মিলন বলতে 'সলভে সম্মেলন'কেই বোঝায়। খুব নির্বাচিত বিজ্ঞানীরা এক সাথে জড়ো হন। পৃথিবীর সমসাময়িক উদ্ভাবনা ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। পৃথিবীর প্রথম 'সলভে সম্মেলন' ১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন' কালোবস্তুর বিকিরণ। কারা সব ছিলেন সেখানে? ছবিটি দেখলেই আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। অনেকে বলেন, ১৯০০ সালে কোয়ান্টাম তত্ত্ব জন্ম নিলেও তার প্রকৃত সামাজিকীকরণ এই ১৯১১ সালের সলভে সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। নীলস বোরের কাজের কথা আমরা আগে বলেছি। কোয়ান্টাম ভাবনা ছাড়া পরমাণুকে বোঝাতে পারেননি। মজার কথা, বোরের কখনও এই কোয়ান্টাম ভাবনা নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। ধাতুর ইলেকট্রনিয় তত্ত্ব নিয়ে ডক্টরেটের কাজ করছিলেন বোর। তার সফলতা আর ব্যর্থতার অনুসন্ধানে ডুবে রয়েছেন। ডক্টরেট হলো। এরপরের কাজে রাদারফোর্ডের দিকে চোখ ফেরালেন। রাদারফোর্ডের পরমাণু ধারণাকে বুঝতে চাইলেন। বুঝতে গিয়েই সব রকমের বিপদ ঘটল। না কি বোর আরও অপরিহার্য হয়ে উঠলেন আমাদের কাছে? বর্ণালী ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম ভাবনা ছাড়া আর কোনোকিছুই কাজে লাগল না। পরপর এতো কাজ হতে থাকল, যাঁকে বিজ্ঞানমহল 'কনসিয়েন্স অফ ফিজিক্স' বলে ডাকেন, সেই উলফ্যাং পাউলি কেমন মন্তব্য করেছিলেন, আমরা একবার দেখি–

"All the moment, Physics is again very muddled: in any case, it is far too difficult for me, and I wish I were a movie comedian or something of the sort and had never heard of physics."

যাই হোক, সেই যে প্লাঙ্ক আমাদের কোয়ান্টাম পথ ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন, আজও আমরা হেঁটে চলেছি। বিজ্ঞানজগতের একগুচ্ছ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এই পথে হেঁটেই অসামান্য সৃষ্টিসম্ভার রচনা করেছেন। কারও কারও কথা বলেছিও আগে আমরা। আইনস্টাইন, বোর-তোর রয়েছেনই। আর তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকে দ্য ব্রগলি (১৯২৩), হাইজেনবার্গ (১৯২৫), ম্যাক্স বর্ন (১৯২৫), শ্রয়ডিঞ্জার (১৯২৬) এবং আরও অনেকেই রয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরে আমরা এ সময়ের দুই সেরা আবিষ্কার লেসার ও অতিপরিবাহিতার কথা বলব। দেখব, কোয়ান্টাম ভাবনা তৈরি না হলে এসব আবিষ্কারের দিকেও আমরা যেতে পারতাম না।

★ *প্রবন্ধকার জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও গ্রন্থাকার এবং প্রাগ্রসর বিজ্ঞানাগার খুলনার সাধারণ সম্পাদক।*

রপ্তানিযোগ্য ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও রপ্তানি অব্যাহত রাখতে আমাদের করণীয়

ড. মোঃ শরফ উদ্দিন

রপ্তানি একটি দেশের জন্য গৌরবের বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের স্বপ্ন থাকে দেশের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে এবং অতিরিক্ত অংশ রপ্তানি করতে। তবে রপ্তানি যে দেশেই করা হোক না কেন সে দেশের অর্থাৎ আমদানিকারক দেশের পছন্দ অনুযায়ীই পণ্য তাদেরকে আমদানি করতে হয়। আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসমূহ রপ্তানি উপযোগী নয়। তবে উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে একটু যত্নবান হলেই এদেশের কৃষি পণ্যসমূহ অত্যন্ত সহজেই বিদেশে রপ্তানি করা যায়। আপনারা জেনে খুশি হবেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন সবজি ও ফল রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে মাঝে মধ্যেই এক-একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় এবং কোনো পণ্যের রপ্তানিতে একবার নিষেধাজ্ঞা আসলে তা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। এর কারণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মাঠ পর্যায়ে চাষী হতে শুরু করে এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে কোনো না কোনোভাবে এর জন্য দায়ী। আসলে ফল এবং সবজি রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে সেগুলোই এখন আলোচনা করবো।

রপ্তানির বিষয়টি এদেশের ফল ও সবজি চাষীদের নিকট একেবারেই নতুন। তবে কোনো কোনো এলাকার চাষীরা রপ্তানির বিষয়ে একটু অগ্রগামী। ঢাকার সাথে যে জেলাগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করা যায় সেসব এলাকাগুলোকেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়। এখন আমরা পরিচিত হবো যে ফল ও সবজিগুলো এদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়। সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো করলা, কাকরোল, ঝিংগা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, বরবটি, শশা, ঢেঁড়স, শিম, কাঁচামরিচ, নাগা মরিচ, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি। আর ফলের মধ্যে শুধু আম ও লটকন। তবে বর্তমানে এদেশে ৭০টি ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০টির বেশি প্রজাতির ফল রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যদি আমের কথাই ধরি তাহলে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে আম সংগ্রহ করার পর থেকেই। এদেশে জন্মানো সকল জাত রপ্তানিযোগ্য নয়। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার কোন জাতগুলো রপ্তানি করা যাবে। হিমসাগর, খিরসাপাত, বারি আম-২ বা লক্ষণভোগ, ল্যাংড়া, ফজলি, বারি আম-৩ বা আম্রপালি, বারি আম-৭ ও আশ্বিনা জাতের আম সহজেই রপ্তানি করা যাবে। তবে ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত হাড়িভাঙ্গা আমটিকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। অন্যান্য জাতগুলো বিভিন্ন কারণে রপ্তানি করা আপাতত সম্ভব নয়।

তবে যে জাতই হোক না কেন আমগাছ হতে আম সংগ্রহের পর হতে বিভিন্ন পরিচর্যার প্রয়োজন। যেমন– প্রুনিং, ট্রেনিং, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা ও রোগ এবং পোকামাকড় দমন পদ্ধতি ইত্যাদি। আমগাছ হতে আম সংগ্রহ করার পর রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা একটু ভালো অংশসহ কেটে ফেলতে হবে। ডালপালা এমনভাবে ছাটাই করতে হবে যেন গাছের ভিতরের অংশে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যালোক পৌছাতে পারে। গাছের ভিতরমুখী ডালে সাধারণত ফুল-ফল হয় না, তাই এ ধরনের ডাল কেঁটে ফেলতে হবে। ফলে বর্ষাকালে কর্তিত অংশগুলো হতে নতুন কুশি জন্মাবে এবং পরের বছরে এ নতুন কুশিগুলোতে ফুল আসবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, ডগার বয়স ৫-৬ মাস না হলে ঐ ডগায় সাধারণত ফুল আসে না। আগামী

BANSDOC Library * Dhaka *

বছরে একটি গাছে কী পরিমাণ ফলন হতে পারে তা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই ধারণা পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে গাছে যত বেশি নতুন ডগা বের করা যায় ততই উত্তম।

এরপর যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো আমবাগানে সার প্রয়োগ। আমবাগান হতে প্রতি বছর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সময়মতো সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি গাছে প্রতি বছর কী পরিমাণ সার দিতে হবে তা নির্ভর করে মাটিতে বিদ্যমান সহজলভ্য পুষ্টি উপাদানের উপর। সব ধরনের মাটিতে সারের চাহিদা সমান নয়। সুতরাং মাটির অবস্থাভেদে সারের চাহিদা কমবেশি হতে পারে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের চাহিদাও বাড়তে থাকে। নিচে আমগাছের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

গোবর সার দিতে হবে রোপনের ১ বছর পর ২০ কেজি, রোপনের ২ বছর পর ২৫ কেজি, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ৫ কেজি এবং ২০ বছর পর এর উর্ধ্বে প্রতিটি গাছের জন্য ১২৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ইউরিয়া রোপনের ১ বছর পর ২৫০ গ্রাম, রোপনের ২ বছর পর ৩৭৫ গ্রাম, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ১২৫ গ্রাম এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ২৭৫০ গ্রাম সার প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি রোপনের ১ বছর পর ১০০, রোপনের ২ বছর পর ২০০, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ১০০ এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ২১৫০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হবে। এমপি রোপনের ১ বছর পর ১০০ গ্রাম, রোপনের ২ বছর পর ২০০ গ্রাম, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ১০০ গ্রাম এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ২১৫০ গ্রাম সার প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম রোপনের ১ বছর পর ১০০ গ্রাম, রোপনের ২ বছর পর ১৭৫ গ্রাম, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ৭৫ গ্রাম এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ১৬০০ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োগ করে হবে। জিংক সালফেট রোপনের ১ বছর পর ১০ গ্রাম, রোপনের ২ বছর পর ১৫ গ্রাম, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ৫ গ্রাম এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ১১০ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। বোরিক এসিড রোপনের ১ বছর পর ০৫ গ্রাম, রোপনের ২ বছর পর ০৭ গ্রাম, প্রতি বছর বাড়াতে হবে ০২ গ্রাম এবং ২০ বছর ও এর উর্ধ্বে ৫০-১০০ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে কিছু অসাধু আম ব্যবসায়ী আম গাছে প্যাকলোবিউটাজল নামক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছেন, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। এটি ব্যবহারের ফলে আমগাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছ মারাও যেতে পারে।

সমস্ত সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো। প্রথম অর্ধেক বর্ষার আগে এবং বাকি অর্ধেক আশ্বিন মাসে অর্থাৎ বর্ষার পরে প্রয়োগ করতে হবে। যদি কোনো আমচাষী প্রথম কিস্তিতে সার প্রয়োগ না করে থাকেন তবে অবশ্যই দ্বিতীয় কিস্তিতে চাহিদার পুরোটাই প্রয়োগ করতে হবে এবং সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক আমচাষী বাগানের ফজলি ও আশ্বিনা আম সংগ্রহ করার পর সার প্রয়োগ করেন, যা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফলন্ত গাছে গুড়ি থেকে ২-৩ মিটার দূরত্বে ৩০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত ও ১৫-২০ সেন্টিমিটার গভীর করে চক্রাকার নালা কেঁটে নালার ভেতর রাসায়নিক ও জৈব সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অথবা দুপুরবেলা যতটুকু জায়গায় গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সাধারণত আমগাছে ফল আসার পর গাছগুলো দুর্বল হয়ে থাকে। ফলে গাছের প্রয়োজন হয় খাদ্যের। সার দেওয়ার পর বর্ষা আরম্ভ হলে গাছ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য মাটি থেকে নিতে থাকে। ফলে গাছে নতুন পাতা বের হয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায়, অনেকেই প্রতিবছর সার প্রয়োগ করেন না অথবা দেরীতে সার প্রয়োগ করে থাকেন। ফলে তারা আশানুরূপ ফলন পাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, জুন-আগস্ট মাসে আমগাছে যত বেশি নতুন পাতা বা ডগা বের হবে ততই উত্তম। কারণ পরবর্তী বছরে এসব ডগায় ফুল আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে আমের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

সার প্রয়োগের পর যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো আমবাগানে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। খরা মৌসুমে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। তবে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে সেচের প্রয়োজন পড়ে না। গবেষণা করে দেখা গেছে, আমগাছে পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে অর্থাৎ গাছের গোড়ার চারিদিকে ১ মিটার জায়গা সামান্য উঁচু রেখে দুপুরবেলা যতটুকু জায়গায় গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় একটি থালার মতো করে বেসিন তৈরি করে সেচ প্রয়োগ করলে সেচে পানির পরিমাণ কম লাগে এবং গাছ বেশির ভাগ পানি গ্রহণ করতে পারে। বেসিন পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হলো গাছের গোড়া পরিষ্কার থাকে ফলে আগাছা জন্মাতে পারে না। সেচ প্রয়োগকৃত জায়গা কচুরিপানা দ্বারা ঢেকে দিলে মাটিতে এক মাস পর্যন্ত আর্দ্রতা ধরে রাখে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে আম চাষাবাদের জন্য মালচিং প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তবে আমগাছে ফুল আসার এক মাস আগে সেচ না দেওয়া উত্তম। কারণ কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, এ সময় সেচ দিলে গাছে নতুন পাতা বের হয় ফলে মুকুলের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলন কম হয়। আমবাগানে জৈব পদার্থের ঘাটতি থাকলে ধৈঞ্চার চাষ করা যেতে পারে। ফলে বাগানে জৈব পদার্থসহ অন্যান্য সার যোগ হবে এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

রোগাক্রান্ত ও পোকায় আক্রান্ত আম রপ্তানি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই রোগ ও পোকামাকড় অবশ্যই দমন করতে হবে তবে তা অবশ্যই যথাযথ নিয়মে ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে। রপ্তানিযোগ্য আমে অতিরিক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার মোটেই কাম্য নয়। অনেকে মনে করতে পারেন, বালাইনাশক অতিরিক্ত ব্যবহার করলে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আসলে বিষয়টি ঠিক নয়। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আম রপ্তানির জন্য নির্বাচন করা হয় না। আমের জন্য তিনবার স্প্রে করা জরুরি। প্রথমবার মুকুল আসার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে, দ্বিতীয়বার মুকুল যখন ১০-১৫ সেমি. লম্বা হয় এবং শেষবার আম মটর দানাকৃতি হলে। এরপর ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ভালো মানের রপ্তানিযোগ্য আম পাওয়া যাবে। ব্যাগিং করার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যা অবশ্যই মানতে হবে। আমের গুটি বাধার ৪০-৫৫ দিন পরে ব্যাগিং করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তবে ফজলি ও আশ্বিনা জাতের গুটির বয়স ৬৫ দিন পর্যন্ত ব্যাগিং করা যাবে। যেকোনো জাত পরিপক্ব হওয়ার ৭ দিন পূর্বে ব্যাগ খুলে দেখতে হবে। অথবা সংশ্লিষ্ট গবেষকের সাথে পরামর্শ করে আম সংগ্রহ করতে হবে। রপ্তানির আম সংগ্রহ করা হয় তুলনামূলকভাবে কয়েকদিন পূর্বে তবে আমটি অবশ্যই পুষ্ট হতে হবে। কারণ রপ্তানিযোগ্য আমের সংরক্ষণকাল বেশি ভালো হয়। পাকা আম কোনোভাবেই রপ্তানির জন্য উপযুক্ত নয়। আম সংগ্রহ হতে শুরু করে প্যাকিং, পরিবহনে আম যেন কোনো আঘাত না পায় সেদিকে বিশেষ মনযোগ দিতে হবে। একইভাবে অন্যান্য ফল ও সবজির বেলায় রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়মনীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। ফসল উৎপাদনের একেবারে শুরু থেকে সংগ্রহ করা পর্যন্ত কী কী ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে তা রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কৃষি অফিস, রপ্তানিকারক ও গবেষকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে রপ্তানি একটি দেশের জন্য সম্মান, কারও কোনো অসাধু তৎপরতায় যেন এটি বন্ধ না হয় সেই বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই আমাদের দেশে উৎপাদিত ফল ও সবজি রপ্তানির ধারা অব্যহত থাকবে।

★ *প্রবন্ধকার আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।*

ওমেগা-৩ ডিম?

মো: খোরশেদ আলম

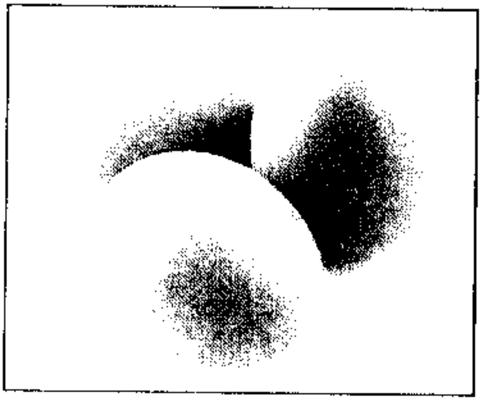

ইদানিং ওমেগা ডিম নিয়ে বড় বড় শহরে বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চটকদার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্রেতাদের নজর কাড়ার চেষ্টা চলছে। ওমেগা ডিমের বর্তমান বাজারমূল্য সাধারণ ডিমের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণি, সচেতন ও অধিক শিক্ষিত লোকজন জটিল হৃদরোগ, যৌন রোগ, যৌন দুর্বলতা, ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার রোগের মতো নানা সমস্যা থেকে রক্ষার জন্য ওমেগা ডিমের পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ওমেগা-৩ ডিম কী? এ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ওমেগা ডিম

যে ডিমে ওমেগা-৩ ফ্যাটের পরিমাণ কিছুটা বেশি বা আদর্শ মাত্রায় থাকে তাকে ওমেগা-৩ ডিম বলা হয়। সাধারণ ডিমে মাত্র শতকরা সর্বোচ্চ ১ ভাগ এবং ওমেগা ডিমে তার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ওমেগা-৩ বিদ্যমান থাকে। ওমেগা-৩ অসম্পৃক্ত এসেনশিয়েল ফ্যাটি এসিড, যা মানুষের দেহে তৈরি হতে পারে না। এজন্য বাহির থেকে বাছাই করা খাদ্যের সাথে তা গ্রহণ করতে হয়। ওমেগা-৩ ফ্যাট তিন প্রকার হয়ে থাকে; যেমন– ডকোসা হেক্সিনয়িক, ইকোসা পেন্টিনয়িক এবং আলফা লিনোলিনিক এসিড। কেবল সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলে ডকোসা হেক্সিনয়িক এবং ইকোসা পেন্টিনয়িক এসিড বেশি থাকে, যা মানুষের দেহের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধে খুব বেশি উপকারী। তিসি, সয়াবিন ও আখরোটের মতো কিছু উদ্ভিদ জাত তেলে আলফা লিনোলিনিক এসিড বেশি থাকে। দেহে এনজাইমের পরিমাণ বেশি থাকলেই কেবল আলফা লিনোলিনিক এসিড সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে ডকোসা হেক্সিনয়িক ও ইকোসা পেন্টানয়িক এসিডে রূপান্তরিত হতে পারে। সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলের বাজারমূল্য অনেক বেশি হওয়ায় পোলট্রি খামার মালিকগণ ওমেগা ডিম তৈরির জন্য লেয়ার মুরগির খাদ্যের সাথে তিসি, সয়াবিন, সরিষা, তিল বা পাম তেল মিশ্রণ করে ওমেগা ৩ ডিম তৈরি করার চেষ্টা করেন, যা ওমেগা ডিমের নামে কেবল প্রতারণার সামিল।

ওমেগা-৩ এর উপকারিতা

ওমেগা-৩ মানুষের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার এক মহৌষধ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওমেগা ফ্যাট যকৃতের মাধ্যমে বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে পুরুষ ও মহিলাদের যৌন হরমোন, যথাক্রমে টেস্টোস্টারন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওমেগা-৩ ফ্যাট মানুষের হৃদরোগ, ক্যান্সার, অস্থিক্ষয় রোগ, চক্ষু রোগ এবং কোলস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া এটি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানী, চর্মরোগ, মস্তিষ্কের জটিলতা, স্নায়ুরোগ এবং বাত ব্যথার মতো রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

আমরা ডিম খাই কেন?

বাংলাদেশের মানুষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ০.৭৫ – ১.০ গ্রাম হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫৬ গ্রাম আমিষ প্রয়োজন হয়। আইসল্যান্ডের লোকেরা দৈনিক গড়ে ১৩৩ গ্রাম আমিষ খায়। জাতিসংঘের এফএও-এর এক হিসাব মতে আমরা বাংলাদেশে জনপ্রতি গড়ে মাত্র ৪৯ গ্রাম আমিষ গ্রহণ করে থাকি। মেক্সিকোর লোকেরা যেখানে বছরে প্রায় ৩৫৮টি ডিম খেয়ে থাকে। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বছর গড়ে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৭০টি ডিম খেয়ে থাকি। মূলত আমিষের অভাব পূরণের জন্য আমরা ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ও ডালজাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকি। আমরা চাল, গম, ভুট্টা, আলু জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকি শর্করা জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য। শাকসবজি, ফলমূল খাই খনিজ ও ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য। উদ্ভিজ্জাত তেল ও মাছের তেল গ্রহণ করি প্রধান শক্তি ও ওমেগা-৩ এর চাহিদা পূরণের জন্য। সুতরাং নিয়মিত শাকসবজি, ফল ও সামুদ্রিক মাছ খেয়ে আমরা অতি সহজে এবং সস্তায় ওমেগা-৩ এর অভাব পূরণ করতে পারি। ডিমকে ডিমের মতো রাখাই উত্তম। ইদানিং অধিক প্রচারিত ওমেগা-৩ ডিম বা হলুদ কুসুমের নামের ডিমের ভিতর দিয়ে অতিরিক্ত ভিটামিন বা ওমেগা-৩ খাওয়ানোর লোভ দেখানোর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডিমের পুষ্টি তথ্য

খোসাবিহীন একটি ডিমে মোট ওজনের শতকরা ৭৩.৭ ভাগ পানি ০.৯ ভাগ শর্করা, ১২.৯ ভাগ আমিষ এবং শতকরা ১১.৫ ভাগ ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে। মোট ফ্যাটের মধ্যে শতকরা ৩৭.৫ ভাগ সম্পৃক্ত এবং ৬২.৫ ভাগ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডে শতকরা ৪৬ ভাগ মনো এবং শতকরা ১৬.৫ ভাগ পলি আনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (ওমেগা-৩, ৬) বিদ্যমান থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের একটি সাধারণ ডিমে কমপক্ষে ০.৬৬ গ্রাম ওমেগা-৩ বিদ্যমান থাকে। উক্ত ওমেগা-৩ হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ মানুষের বিভিন্ন রোগ দমন ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ওমেগা-৩ এর উৎস

তিসির তেল ও মাছের তেল বিশেষ করে ক্রিল (ছোট চিংড়ি জাতীয়) মাছ, টুনা, মেকারেল, ট্রাউট, হেরিং, সার্ডিন ও সেলমন ইত্যাদি সামুদ্রিক মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণে (শতকরা ১.২ – ২.৬ গ্রাম পর্যন্ত) ওমেগা-৩ বিদ্যমান থাকে। শতকরা হিসেবে আখরোট বীজে ২.৩, মেকারেল মাছে ১.৯৫, সেলমন মাছে ১.৫০,

তিসির বীজে ১৮ [illegible] মাছে শতকরা ১.৬ ভাগ ওমেগা-৩ বিদ্যমান থাকে। এছাড়া শাকসবজি যেমন– গাজর, প[illegible], ফুলকপি, বাধাকপি, লেটুস, ব্রকলি, শাক ও স্পিরিলুনাতে ওমেগা-৩ থাকে। এছাড়া সয়াবিন, [illegible]ড়া, সরিষা, লাই এবং সূর্যমুখী বীজ হতেও অল্প পরিমাণে ওমেগা-৩ পাওয়া যায়। বিশেষ কিছু [illegible] তেলে আলফা লিনোলিনিক এসিড এবং কিছু সামুদ্রিক মাছের তেলে ডকোসাহেক্সিনয়িক [illegible] পেন্টিনয়িক এসিড বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এর পরামর্শ মতে আমাদেরকে [illegible] কমপক্ষে ০.৩ – ০.৫ গ্রাম ডকোসা হেক্সিনয়িক ও ইকোসা পেন্টিনয়িক, এর সাথে ০.৮ – ১.১০ গ্রাম [illegible] লিনোলিনিক এসিড গ্রহণ করতে হবে। ইদানিং পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ মানুষের জন্য দৈনিক ১.০ – ৩.[illegible] ওমেগা-৩ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন।

বাজারের ওমেগা ডিম

লেয়ার মুরগি খামারে সুষম খাদ্যের সাথে উপরে উল্লিখিত সামুদ্রিক মাছের তেল, ফিস মিল (মাছের গুড়া) পরিমাণমতো ব্যবহার করলেই কেবল ওমেগা ডিম তৈরি হবে। শুধু তিসি, সয়াবিন বা কোনো উদ্ভিদজাত তেল ব্যবহার করলে ওমেগা-৬ এর পরিমাণ বেড়ে যাবে, যা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত হবে না। ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ এর অনুপাত ১ : ১ থাকা উচিত। খাদ্যমিশ্রণে ওমেগা-৬ এর পরিমাণ বেশি হলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তখন লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি থাকে। ওমেগা ডিম এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ডিমে মোট সম্পৃক্ত ফ্যাট শতকরা হিসেবে সর্বোচ্চ ৩১, মনো সম্পৃক্ত ফ্যাট সর্বোচ্চ ৪৭, অসম্পৃক্ত ফ্যাট কমপক্ষে ২১, ওমেগা-৬ এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৫, ওমেগা-৩ এর পরিমাণ কমপক্ষে ৭, আলফা ডিম কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের সহজ-সরল ক্রেতাগণ পুষ্টি ও রসায়ন বিদ্যার জটিল বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। সুতরাং ওমেগা ডিম বাজারজাত করার পূর্বে স্থানীয় প্রশাসনকে বিএসটিআই, পশু সম্পদ অধিদপ্তর ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে উক্ত ডিম যাচাই বাছাইয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যাচাইয়ের পরই কেবল প্রকৃত ওমেগা ডিমের বাজারজাতকরণের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থার ছাড়পত্র বিহীন ওমেগা ডিম বা অর্গেনিক ডিম বাজারজাত করা বন্ধ করা উচিত। তা না হলে পল্লী এলাকার অল্পশিক্ষিত বুদ্ধিমান জনগণ বিশুদ্ধ অর্গেনিক ডিম, দুধ, মাছ, মাংস খেয়ে সুস্থ থাকবেন, অন্যদিকে আমরা শহরের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সচেতন নাগরিকগণ ওমেগা-৩ এর প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ব।

(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট এবং USDA জাতীয় পুষ্টি ডাটাবেজ্ড)

★ *প্রবন্ধকার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কো-অর্ডিনেটর (অব.)*

নতুন ৪টি আইসোটোপ আবিষ্কার এবং সবুজ রসায়নে গ্রাফিনের ব্যবহার

শহীদ হোসেন

বর্তমান যুগে আইসোটোপের ব্যবহার এক কথায় বৈপ্লবিক। তেজক্রিয় আইসেপাটোপ কোবাল্ট-৬০ এর সাহায্যে ক্যান্সার নিরাময়, ফসফরাস-৩২ দিয়ে রক্তাল্পতাজনিত রোগ পলিসাইথেমিয়াভেরা, আয়োডিন-১৩১ ব্যবহার করে থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ চিকিৎসা। কৃষিবিজ্ঞানে, জীববিজ্ঞানে, পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল নির্ধারণে আইসোটোপের ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

রসায়নের জন্য আইসোটোপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইসোটোপ আবিষ্কার দ্বারা মানুষ নিশ্চিত হয় যে, পারমাণবিক ভর অনুসারে পর্যায় সারণি সাজানোতে ত্রুটি ছিল। কিন্তু যখনই পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে সাজানো হয় তখন পর্যায় সারণীর অবস্থানজনিত সমস্যা দূর হয় কারণ আইসোটোপসমূহের ভর সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা একই। এখন নিচে নতুন ৪টি আইসোটোপ কীভাবে আবিষ্কৃত হয় তা নিয়ে আলোচনা করব।

পদার্থের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের উপর পরীক্ষাকালীন সময়ে ১৯১৩ সালে তেজস্ক্রিয় রসায়নবিদ ফ্রেডরিক সোড্ডে পর্যায় সারণীর একই স্থানে একাধিক মৌলের অবস্থান আবিষ্কার করেন। একই ধরনের বৈশিষ্ট্যবহনকারী পর্যায়সারণীতে একই স্থান দখলকারী এই কণাসমূহকে মার্গারেট টোড 'আইসোটোপ' নামকরণ করেন। গ্রিক শব্দ isos = একই, topos = স্থান, আর এর জন্যই আইসোটোপের অপর নাম হলো 'সমস্থান'।

একই বছর জে জে থমসন একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন, যেখানে চৌম্বকীয় ও তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে নিয়ন আয়নের প্রবাহ পরিচালনা করেন, যা অপর প্রান্তে একটি ফটোগ্রাফিক পাতে বাধা পায়। তিনি পাতে বাধাপ্রাপ্ত নিয়ম আলোর দুটি বিচ্যুতি দেখতে পান। থমসন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এখানে উপস্থিত কিছু নিয়ন আয়নের ঘনত্ব আলাদা। ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের পর একই মৌলের ভিন্ন ভর থাকার ব্যাখ্যা উদ্‌ঘাটিত হয়।

প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন আইসোটোপের সংখ্যা ৩,৩৯,২৮৮টি হলো প্রাইমর্ডিয়াল বা আদিম এবং ২৫৯টি স্থায়ী আইসোটোপ। প্রাইমোর্ডিয়াল আইসোটোপ হলো সেসব আইসোটোপ যেগুলো পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব হতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত একই রূপে অক্ষত রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, কিছু কিছু স্থায়ী আইসোটোপও তেজস্ক্রিয় যাদের অর্ধায়ু বা হাফ-লাইফ অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মোট আইসোটোপের সংখ্যা হলো ৩১০০টি।

আন্তর্জাতিক স [illegible] সংস্থার একটি অংশ হিসেবে ম্যানিপাল ইউনিভার্সিটি, কর্ণাটক-এ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ম্যানিপাল [illegible] এইচএম দেভারাজা, চার নতুন আইসোটোপ আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীতে পর্যায় সারণীতে [illegible] ২০১৬ হিসেবে যুক্ত হবে। এ ৪টি আইসোটোপ এর ২টি হলো ভারী উপাদান বার্কেলিয়াম (Bk [illegible] পারমাণবিক সংখ্যা 97) এবং নেপচুনিয়াম (NP, 93) এবং অপর দুটি আইসোটোপের প্রতিটি উপাদান [illegible] রিসিয়াম (Am, 95) যাদের পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট মৌলের চেয়ে কম নিউট্রন সংখ্যা ও নমনীয় ৩জন বিজ্ঞা [illegible] পরীক্ষার জন্য গবেষকরা উত্তেজিত ক্যালসিয়াম নিউক্লিই দ্বারা কিউরিয়ামের একটি ৩০০-ন্যানোমিটার [illegible] স্তরে আঘাত করেন। সংঘর্ষের ফলে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য দুটি উপাদান পরমাণুর কেন্দ্রভা [illegible] একটি যৌগ সিস্টেম গঠিত হয়। যৌগ সিস্টেম পুনরায় ভেঙে যাওয়ার পূর্বে, ১৬ কোটি ভাগের ১ সে [illegible] দুটি নিউক্লিই যুক্ত হলে তারা গঠিত বাধা দ্বারা প্রোটন ও নিউট্রন বিনিময় করে: এ বিনিময়ে সময় [illegible] পদার্থের সাথে বিভিন্ন আইসোটোপ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পরিমাণ অনুসারে, আরও ৪০০০ এর [illegible] আইসোটোপ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, যা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়েছে। এখন গ্রা [illegible] আলোচনা করব–

নোবেল পুরস্কার [illegible] প্রথম দিকে এ রকম কিছু ঘটনা ঘটেছিল যেমন– রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কারের ৬ বছ [illegible] ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, ১৮৯৮ সালে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের পাঁচ [illegible] পিয়েরে ও মেরি কুরি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০৩ সালে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি [illegible] থেকে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে এ অবস্থা বদলে যায়। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে যুগা [illegible] আবিষ্কার করলেও তার পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া না গেলে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না। [illegible] অপেক্ষা করতে হয় অনির্দিষ্ট কাল। আর পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞান যুগান্তকারী আবিষ্কারের ক্ষেত্রে [illegible] করতে হয় সেই আবিষ্কারের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফলের জন্য। যেমন– ম্যাগনেটিক রেজো [illegible] ইমেজিং বা এমআরআই আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু সেই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুর [illegible] দেওয়া হয়েছে চৌত্রিশ বছর পর ২০০৪ সালে ততদিনে এমআরআই চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি বহুল ব্যবহৃ [illegible] চার্জ-কাপলড ডিভাইস বা সিসিডি এবং অপটিক্যাল ফাইবার আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৭০ সালে। তখ [illegible] ডিজিটাল ডিভাইসে এদের ব্যাপক ব্যবহার চলছে গত ৩০ বছর ধরে। অথচ সিসিডি ও অপটিক [illegible] ফাইবার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মাত্র গত ২০০৯ সালে। কিন্তু এত কিছুর [illegible] মাঝে মাঝে আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম ঘটে যায়, যেমন ঘটেছে ২০১০ সালের পদার্থবিজ্ঞানের নো [illegible] পুরস্কারের ক্ষেত্রে। ২০০৪ সালে অক্টোবরে গ্রাফিন আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এটি তা [illegible] জন্য আন্দ্রে গেইম এবং কনস্টানটিন নভোসেলভ ২০১০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার [illegible] এতেই বোঝা যায়, গ্রাফিন হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী আবিষ্কার।

গ্রাফিন হচ্ছে পরমা [illegible] পুরুত্বের একটি মৌচাকের মতো কেলাস, যাকে মূলত একটি দ্বিমাত্রিক কার্বন চাকতি হিসেবে বিবে [illegible] যায়। গ্রাফিন (ইংরেজি : Graphene) এক ধরনের কার্বন, যা একটি সরু চাকতিরূপে বিরাজ [illegible] চাকতিটির ক্ষেত্রফল যত বড়ই হোক না কেন পুরুত্ব হয় মাত্র একটি পরমাণুর আকারের সমান। এ [illegible] পরমাণুগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে, একটি দ্বিমাত্রিক মৌচাকের মতো আকৃতি গঠিত হয়। এটি স্য [illegible] স্বচ্ছ।

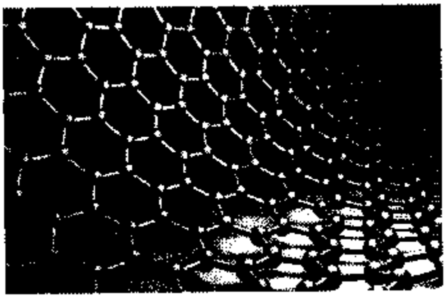

গ্রাফিনে বিদ্যুৎ কোনো প্রকার ক্ষয় ব্যতিরেকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গমন করতে পারে। ইস্পাতের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী এবং এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব মৌল ও যৌগের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী। প্লাস্টিকের মধ্যে শতকরা মাত্র ১ ভাগ গ্রাফিন মেশালে তা তড়িৎ সুপরিবাহীতে পরিণত হতে পারে। গ্রাফিনের প্রথম গুণ হলো, এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব মৌল ও যৌগের মধ্যে গ্রাফিনই সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী। ফলে কম্পিউটারে সিলিকন চিপের বদলে গ্রাফিন ব্যবহার শুরু হলে কম্পিউটারের গতি কমপক্ষে শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে মহাকাশ, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানের বিভিন্ন গবেষণায় এ উচ্চগতির কম্পিউটার ব্যবহার বিজ্ঞানীদের কাজকে আরও সহজ করে দিবে। দ্রুতগতির ইন্টারনেটের জন্য গ্রাফিন খুবই কার্যকরী।

এখন নতুন গ্রাফিন কাঠামো আবিস্কার যা সবুজ রসায়নের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা পরিধেয় গ্রাফিন-লেপা কাপড় উন্নত করেন, যা বাতাসে উপস্থিত বিপজ্জনক গ্যাসের সনাক্ত করতে পারে, যা পরিধেয় ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি LED আলোর প্রজ্জ্বলন দ্বারা। ইলেক্ট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কোরিয়ার কনকুক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষক, একটি কাপড় আবিষ্কার করেন, যা তুলা এবং পলিয়েস্টার সুতার উপর গ্রাফিন অক্সাইড চাদর আবৃত, যা প্রস্তুত করা হয় ন্যানোগ্লু নামক জড়বুদ্ধি সিরাম অ্যালবুমিন (BSA) দিয়ে। তারপর গ্রাফিন অক্সাইড সুতা উন্মুক্ত থাকে একটি রাসায়নিক বিজারণ প্রক্রিয়া দ্বারা, যা ইলেকট্রন গ্রহণের সাথে জড়িত। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড থেকে দীর্ঘায়িত এক্সপোজার মানব স্বাস্থ্যের বিপজ্জনক হতে পারে, অনেক নিঃশ্বাস সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ঘটাতে পারে। সাধারণত গাড়ির নিঃসরণ এছাড়াও যে জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বলন ঘটে তা থেকে দূষণকারী গ্যাস নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। তার সনাক্তকরণে গ্রাফিন অক্সাইড-লেপা উপকরণ বিশেষ সংবেদনশীল হতে দেখা যায়। এসব বিশেষিত বস্ত্র এক্সপোজার বিজারিত গ্রাফিন অক্সাইড কাপড় এত স্পর্শকাতর যে প্রতি 30 মিনিট 0.25 অংশে এক্সপোজার হলে একটি বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে LED আলোর প্রজ্জ্বলিত হয়, যার দ্বারা পরিধানকারী সতর্ক হোন। পূর্বে একটি ফ্ল্যাট উপাদান কর্তক প্রস্তুত গ্রাফিন অক্সাইড বস্ত্র সেন্সর থেকে এ গ্রাফিন অক্সাইড সেন্সর বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের প্রতি তিনগুণ বেশি সংবেদনশীল। এ উপকরণ ভবিষ্যতে 'স্মার্ট ফিল্টার' হিসেবে ক্ষতিকারক গ্যাস সনাক্ত করা এবং বায়ু থেকে ফিল্টার করা এ উভয় কাজ করতে এয়ার পাবক ফিল্টার সঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর এভাবে ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ু থেকে অপসারণ করা গেলে এসিড বৃষ্টি ও বায়ুদূষণ কম হবে, যার ফলে পরিবেশ রক্ষা পাবে, যার ফলে এটি সবুজ রসায়নে ভূমিকা রাখবে।

★ *প্রবন্ধকার নটরডেম কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক।*

[illegible]র্যের চাকতির উপর বুধ গ্রহের চলন

মাসুদুর রহমান

বুধ আমাদের সৌ[illegible]চেয়ে ছোট গ্রহ। এটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্যের কাছ দিয়ে চলার কারণে এবং সূর্যের উজ্জ্ব[illegible] খালি চোখে বা টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের আকাশে বুধ গ্রহকে দেখা খুব কঠিন। [illegible] সময় থেকে [illegible] উর্ধ্ব স্থানে অবস্থান করে তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ও সূর্য উদয়ের কিছু সময় পূর্বে একে [illegible] সময়ের জন্য দেখা যেতে পারে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বুধকে দিনের বেলাতেই আকাশে দেখা যায় [illegible] ভাবে বুধকে দেখা সম্ভব, সেটি হলো এটি যখন সূর্যের উপর দিয়ে পরিভ্রমণ করে। উপর দিয়ে [illegible] বলতে বোঝানো হচ্ছে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে যখন বুধ একই সরলরেখায় চলে আসে। এরক[illegible] পৃথিবী থেকে দেখলে দেখা যাবে, বুধ গ্রহ সূর্যের চাকতির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে অতিক্রম কর[illegible] ঘটনাটি সূর্যের চাকতির উপর বুধ গ্রহের চলন বা ট্রানজিট অব মারকারী নামে পরিচিত। এটি এ[illegible] গ্রহণ বা সূর্যের বলয় গ্রহণের সাথে তুলনা করা যায়।

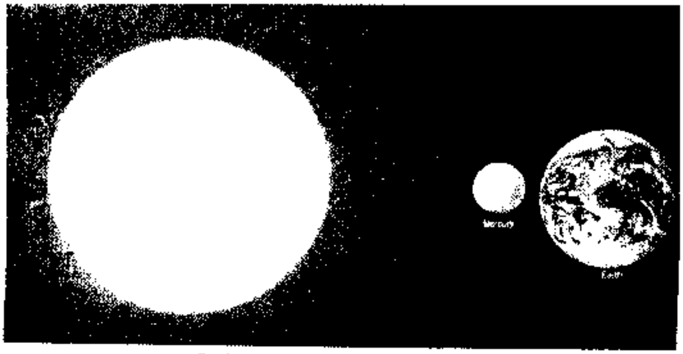

পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে বুধ গ্রহ

Transit of Mercury

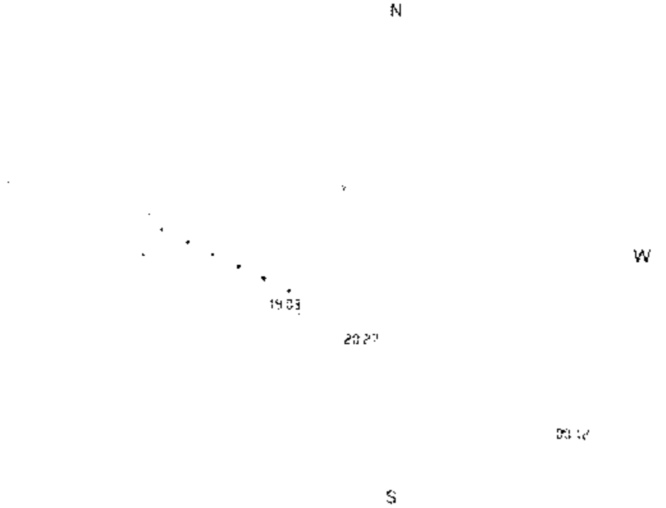

[illegible] সময়ে এভাবেই বুধ গ্রহ সূর্যের উপর দিয়ে অতিক্রম করছে

এই ট্রানজিট বুধ ও শুক্র গ্রহ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কারণ এদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথ ও সূর্যের মধ্যে অবস্থিত। বুধের ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রতি ১০০ বছরে ১৩/১৪ বার ঘটে; আর মজার ব্যাপার হলো, এই ঘটনা মে মাস ও নভেম্বর মাসে ঘটে থাকে। মে মাসে ট্রানজিটের সময় বুধ গ্রহের আপাত ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ১৫৮/১ ভাগ হয়। নভেম্বরের ট্রানজিটকালে বুধ গ্রহের আপাত ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ১৯৪/১ ভাগ হয়। এত ছোট হওয়ার কারণে ট্রানজিটকালে খালি চোখে বুধকে দেখা সম্ভব না। টেলিস্কোপ ব্যবহারের পূর্বে বুধ গ্রহের ট্রানজিট পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ১৬৩১ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিদ 'পিয়র গাসেন্দি প্রথম বুধ গ্রহের ট্রানজিট পর্যবেক্ষণ করেন। ট্রানজিটের সময় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। ১৭৬১ ও ১৭৬৯ সালে শুক্র গ্রহের ট্রানজিটকালে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করেন।

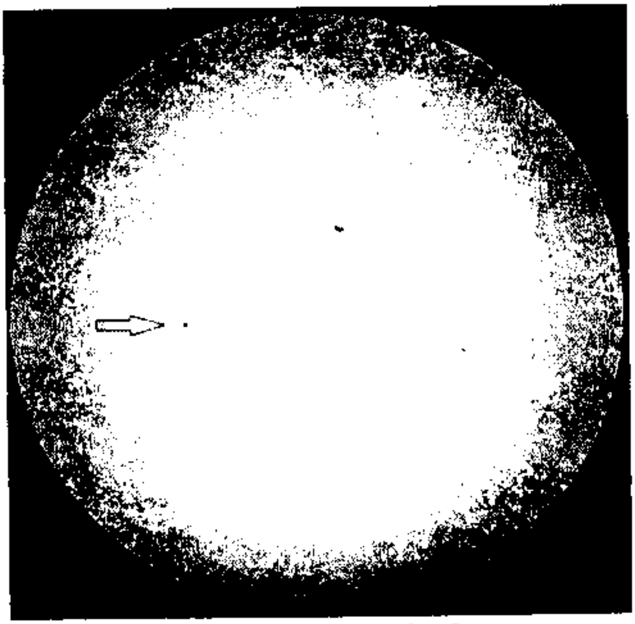

সূর্যের উপর তীর চিহ্নিত কালো বিন্দুটি বুধ গ্রহ

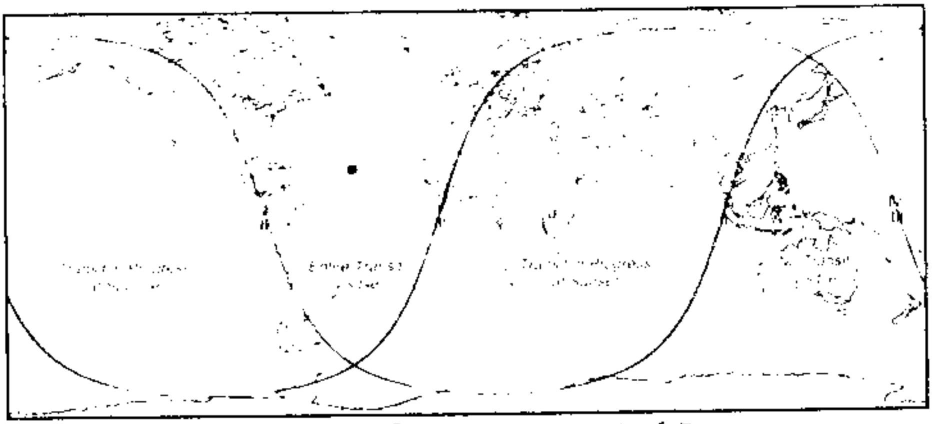

৯ মে, ২০১৬ তারিখে পৃথিবীর যেসব অঞ্চল থেকে ট্রানজিট দেখা গেছে

২০০৪ সালে বিজ্ঞান জাদুঘর মানমন্দির থেকে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট পর্যবেক্ষণ

৯ মে ২০১৬ তারিখ সোমবার বুধ গ্রহের ট্রানজিট বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫-১০ মিনিটে শুরু হয় এবং বুধের ট্রানজিট অবস্থায় সূর্য অস্ত যায়। সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় বিজ্ঞান জাদুঘরের মানমন্দির থেকে এই বিরল মহাজাগতিক ঘটনা দেখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী ট্রানজিট দেখার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান পিপাসুদের অপেক্ষা করতে হবে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। এরও পরের ট্রানজিট ঘটবে ২০৩২ সালের ১৩ নভেম্বর। খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো নিরাপদ না। সোলার টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই বিরল দৃশ্য দেখা যেতে পারে বা প্রতিসরণ টেলিস্কোপ ব্যবহার করে প্রজেকশনের মাধ্যমে এই ট্রানজিট দেখা নিরাপদ।

★ *প্রবন্ধকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর।*

"টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই টেকসই প্রযুক্তি"

৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা (০২-০৪ জুন, ২০১৬)

কেন্দ্রীয় আয়োজন

জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় ১ম স্থান অধিকারীদের তালিকা যারা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করবেন

ঢাকা বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
০১.	ঢাকা	জুনিয়র (জীব)	Vertical Cultivation	Syeda Fabiya Mustary & Urbashi Debnath, Holy Cross Girls High School, Dhaka
		জুনিয়র (ভৌত)	Advanced Road Made with Rubber	Anika Tabassum & Fariha Islam, Holy Cross Girls High School, Dhaka
		জুনিয়র (আই.টি.)	Hunter Cops	Sazidul Alam & Abdul Ahad, Uttara High School & College, Dhaka
		সিনিয়র (জীব)	Light Sourcing By Nature	Ariful Islam & Abu Ablal, KPB School & College, Dhaka
		সিনিয়র (ভৌত)	Anti theft (Using Android)	Jahid Hasan Limon & Lefat Tahbin, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা
		সিনিয়র (আই.টি.)	Search Robot	Ulfat Tahsin & jahid Hasan Limon, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা
		বিশেষ	স্বল্প খরচে মুমূর্ষু রোগীর সাকশন	ডা. মো: রফিকুল ইসলাম, আশিক আদনান, ডিজিটাল সাইন্স ক্লাব, ঢাকা
০২.	নারায়ণগঞ্জ	জুনিয়র		মো: মোজাম্মেল হোসেন ভূইয়া, কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
		সিনিয়র		মো: আনোয়ার জাহিদ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
		বিশেষ		মো: তোফাজ্জল, পর্যবেক্ষণ সায়েন্স ক্লাব, নারয়ণগঞ্জ
০৩.	গাজীপুর	জুনিয়র		সিরাজউদ্দিন খান বিদ্যা নিকেতন এন্ড কলেজ, গাজীপুর
		সিনিয়র		গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর
০৪.	মুন্সীগঞ্জ	জুনিয়র	Wind Train	মাহমুদুল জারিফ, প্রে. প্র. ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রে. ম. স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ
		সিনিয়র	Free Power Supply	মো: হালিমুজ্জামান এবং খায়রুল হাসান, মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মুন্সীগঞ্জ
০৫.	মানিকগঞ্জ	জুনিয়র	ভূমিকম্প সংহনশীল বাসভবন	মো: রাকিবুল হাসান, ফজলে রাব্বি, বুলবুল মুন্সী, নুসরাত জাহান ও শাম্মী আক্তার, মানিকগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ
		সিনিয়র	Power saving and recycling electricity	এম এইস নাহিব ও মো: ইমন চৌধুরী, মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ
		বিশেষ	ডিজিটাল সেচ	মো: শফিকুল ইসলাম, টেক সলিউশন বাংলাদেশ, মানিকগঞ্জ

০৬.	নরসিংদী	জুনিয়র	সি.সি.এম. (কার্বন ক্যাপচার এন্ড স্টোরেজ)	বিজু সাহা, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী
		সিনিয়র	দূষণমুক্ত পরিবেশে সবুজ রসায়ন ও আদর্শ বাড়ি	জিতু আজমাইন, নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ, নরসিংদী
০৭.	কিশোরগঞ্জ	জুনিয়র	সৌর জাহাজ নির্মাণ	নিশাত নাবিলা, তায়েবা হাবিব ও ফারজানা মানামী, এস. ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
		সিনিয়র	চলন্ত চার্জার ও সোলার কুকার	ঋষ নিয়োগী বৃষ্টি, হাসানাত সাইফা রিচি ও আয়শা সিদ্দিকা মুনমুন, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ
		বিশেষ	ভূমিকম্পে রুমে আত্মরক্ষার যন্ত্র	মোবারক হোসেন, তরুণ বিজ্ঞানী মোবারক গবেষণাগার ও বিজ্ঞান ক্লাব, কিশোরগঞ্জ
০৮.	টাঙ্গাইল	জুনিয়র সিনিয়র বিশেষ		
০৯.	ফরিদপুর	জুনিয়র	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে)	ইশরাত জেবিন লিরা, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর
		সিনিয়র	Painless Hostal and Management System	শ্যাম সুন্দর দাস, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর
১০.	রাজবাড়ী	জুনিয়র	স্বল্পমূল্যে কাঠের ডিজাইনার মেশিন	রিয়াসাত ইবনে রইচ (সামিট), রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী
		সিনিয়র	ফসলী জমিতে ও প্রসাধনী সামগ্রীতে PH এর ভূমিকা	রীশয়াত রওশন, রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী
১১.	গোপালগঞ্জ	জুনিয়র সিনিয়র বিশেষ		
১২.	শরীয়তপুর	জুনিয়র	ভূমিকম্প প্রতিরোধ খাট	শরীয়তপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর
		সিনিয়র	Line Following Robot	শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, শরীয়তপুর
		বিশেষ	Digital Water Tank	শরীয়তপুর বিজ্ঞান ক্লাব, শরীয়তপুর
১৩.	মাদারীপুর	জুনিয়র	সরল দোলক	মো: ওবায়দুল হাওলাদার, খোয়াজপুর টেকেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর
		সিনিয়র	পরিবেশ দূষণমুক্ত ও CO_2 নির্গমণ বন্ধের লক্ষ্যে Scientific Restaurant	নুসরাত জাহান মীম, সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১৪.	ময়মনসিংহ	জুনিয়র	স্নেক প্লান্ট থেকে নতুন রূপালী আঁশ উদ্ভাবন	ফারহা বিনতে আজহার অদৃতা, ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ
		সিনিয়র	মহাসড়কে যানবাহনের গতিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন	মো: সাদ্দাম হোসেন, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ
		বিশেষ	রক্তনালীর প্রতিবন্ধকতা (ব্লক) দূরীকরণ ভেষজ	সোহেল আহমেদ, অভিযাত্রিক বিজ্ঞান ক্লাব, ময়মনসিংহ
১৫.	নেত্রকোণা	জুনিয়র	সিঁড়ি ধরের বাতিতে বিদ্যুতের তাপ	কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা
		সিনিয়র	অটোলাইট-বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইট	নেত্রকোণা স: টেক: স্কুল এন্ড কলেজ, নেত্রকোণা
		বিশেষ	ই-বাইক প্রদর্শনী	বসুন্ধরা উদ্ভাবনী ক্লাব, নেত্রকোণা

১৬.	জামালপুর	জুনিয়র	ঘরে ঘরে শিল্প গড়ি, অর্থনীতে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করি	এস এম তৌহিদ জামান নিয়ন, সাইফুল ইসলাম রেজা, ইয়াসির আরাফাত সাব্বির ও আবির রায়হান, জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর
		সিনিয়র	অনুজীব সার প্রস্তুত ও প্রয়োগ	শাকিলা শারমিন, বৃন্দাবা আদনীন, ফারিয়া ফেরদৌস ও শারমিন আলম, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর
		বিশেষ	প্লাস্টিক থেকে জ্বালানী তৈল	মো: তৌহিদুল ইসলাম, এইচ.এম.এস ক্লাব, জামালপুর
১৭.	শেরপুর	জুনিয়র	অক্সিজেন মেকার ফর ফিস এন্ড ফুড স্প্রেড ডিভাইস	শিহাব নূর নাবিল, শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি, শেরপুর, শেরপুর
		সিনিয়র	ইজি ফটো স্কানার মেশিন	মো: ফয়সাল মাহবুব, আনিকা তাহসিন তৃপ্তি ও সানজিদা সাফা তিথী, শেরপুর সরকারি কলেজ
		বিশেষ	জীবন রক্ষার শক কন্ট্রোলার	আনোয়ার শাহাদাত, অনলাইন সায়েন্স ল্যাবরেটরি, শেরপুর

চট্টগ্রাম বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১৮.	চট্টগ্রাম	জুনিয়র	পলিথিন ও কাঠের গুড়া হতে জ্বালানী উৎপাদন	মেজবাউল আলম, হামীম মুনতাসিন ও হাশেনুর মাহীন, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
		সিনিয়র	Smart Energy System	সাবরীনা জসিম, হালা আমাতুন নূও ও শ্রাবন্তী বড়ুয়া, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম
		বিশেষ	ঔষধ হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার	কণা অধিকারী, নিগার সুলতানা ও কাজী মুহাম্মদ ফকরুল ইসলাম, অন্বেষা বিজ্ঞান ক্লাব, চট্টগ্রাম
১৯.	রাঙ্গামাটি	জুনিয়র		
		সিনিয়র		
		বিশেষ		
২০.	বান্দরবান	জুনিয়র	পৃথিবী রক্ষায় বৈশ্বিক উষ্ণয়ন প্রতিরোধ	ইরফানুল হক, মুহাম্মদ আল ফায়েদ শানা অপি, সাদমান সাকিব, নাজমুর হাস রাকিব ও ফারদিন আমির জেমীম, বান্দরবান ক্যান্ট: পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বান্দরবান
		সিনিয়র	Digital Sensor for Anti Accident	গালিব বিন জাবেদ, মো: নাফসিন মাবুদ ইফতি, তন্ময় পালিত ও তাসনীম ইকবাল, বান্দরবান ক্যান্ট: পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বান্দরবান
		বিশেষ	বায়োঃগ্যাস হতে জ্বালানী গ্যাস উৎপাদন	মো: ইউসুফ ও সাদ বিন সেলিম, ফুলকুড়ি আসর, বান্দরবান
২১.	খাগড়াছড়ি	জুনিয়র	দূষণকারী পদার্থ হতে মূল্যবান জ্বালানী প্রস্তুত ও ল্যাম্পের ক্ষমতা নির্ণয়	সাদিত মুহাম্মদ নিলয় ও সমাপন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, খাগড়াছড়ি
		সিনিয়র	স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন	আরিফুল ইসলাম, আরিফ হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক, জাহিদ হোসেন, পুস্পন কান্তি ধর, শাফিন আহমেদ ও হিমেল হোসেন, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি
২২.	কক্সবাজার	জুনিয়র	Fire Extinguisher Form	শাহরিয়ার জামান, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, কক্সবাজার
		সিনিয়র	Android apps	ওমর ফারুক, কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার
		বিশেষ	জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা	সুমন শর্মা, ওপেন আর্ট স্কুল, কক্সবাজার

২৩.	কুমিল্লা	জুনিয়র	Bio-degradable Plastic	হাসিফ আহমেদ (দলনেতা), কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা
		সিনিয়র	Water level Indicator in Water tank	মো: মেজবাহ উদ্দিন সরকার (দলনেতা), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা
		বিশেষ	নিরাপদ রেলপথ	মো: খায়ের উল কাওছার, উদয়ন বিজ্ঞান ক্লাব, কুমিল্লা
২৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জুনিয়র	ডিজিটাল ট্রাফিকিং কন্ট্রোল সিস্টেম	আতাউল্লাহ বাহারী, শাহরিয়ার তানজিম, রাফায়েল খান, সৈয়দ ইরফান উদ্দীন, আফতাব হোসেন আকাশ, সুকান্ত সাহা ও আব্দুল্লাহ আল মাহিন, অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		সিনিয়র	ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন	সিয়ামুল ইসলাম সিয়াম, ফারিয়া মেহরীন দৃষ্টি, মোশাহিদুল্লাহ, মোছা: আনুত আক্তার ও শাওন মিঞা, জাহানারা কুদ্দুস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৫.	চাঁদপুর	জুনিয়র	3D Hologram	নুসরাত জাহান ওহী, খায়রুন মেহজাবিন, জান্নাতুল আক্তার তামান্না ও মৃত্তিকা সেনগুপ্তা, মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর
		সিনিয়র	ভূমিকম্প এলার্ম	জাহিন রাইদাহ মাইশা, মায়িশা মালিহা, রিসাবা ইসলাম, নিগার সুলতানা ও সুমাইয়া বিনতে জিলানী ছোঁয়া, চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁদপুর
		বিশেষ	সরল পেরিস্কোপ	সুলতানা নাসরিন ও এইচ. এম. জাকির, চাঁদপুর স্ফুটনিক বিজ্ঞান ক্লাব, চাঁদপুর
২৬.	নোয়াখালী	জুনিয়র	Wi- tricity	রাফিদ আহনাফ, নোয়াখালী জিলা স্কুল, নোয়াখালী
		সিনিয়র	উন্নত জীবনের জন্য বায়ুদূষণ মুক্তকরণ	আবদুল মোক্তাদির, মিনহাজুর রহমান ও মীন মোহাম্মদ তানভীর, নোয়াখালী সরকারি কলেজ
২৭.	লক্ষ্মীপুর	জুনিয়র	সিন্দুকের সিকিউরিটি সিস্টেম	অমি রানী সাহা, লক্ষ্মীপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর
		সিনিয়র	কার্বন থেকে ল্যাম্প ও হিটার তৈরি	তাসফিকুর রহমান, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর
২৮.	ফেনী	জুনিয়র	Smart Sensibility Man Hole	শাহরিয়ার হৃদয়, মিনহাজুল ইসলাম অনিক ও প্রাদ্যাণ বনিক, ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী
		সিনিয়র	Automatic Light Controller	শাফায়াত হোসেন কাওছার, এম. এম আরিফুর রহমান ও ঈমাম হাসান, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফেনী
		বিশেষ	আলু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	নাঈমা সুলতানা নিপু, সাজেদা আক্তার ও নুসরাত জাহান, বিজ্ঞান ক্লাব, সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী

খুলনা বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
২৯.	খুলনা	জুনিয়র	A Temperature Based Automatic AC/Dc Fan Circuit & LDR Based LED Light	রাহাত আমীন রাব্বি ও শামস হায়দার, খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, খুলনা।
		সিনিয়র	হাইড্রোফোনিক্স	নিশাত তাসনিম প্রীতি, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, বয়রা, খুলনা
		বিশেষ	হেয়ার টনিক	ডাঃ এস কে সাহা, নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব, খুলনা

৩০. সাতক্ষীরা	জুনিয়র	কয়লা হতে উৎপন্ন দূষিত CO_2 গ্যাসকে জ্বালানীতে (পেট্রোলে) রূপান্তর	ফারজানা ইয়াসমিন, সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা
	সিনিয়র	অটোমেটিক রাইচ এন্ড কারী	মো: তানভীর হোসেন, নবজীবন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা
	বিশেষ	Automatic Water Tap	মো: আবুল কালাম আজাদ, Morden Association of Science & Technology, সাতক্ষীরা
৩১. বাগেরহাট	জুনিয়র		
	সিনিয়র		
	বিশেষ		
৩২. যশোর	জুনিয়র	ড্রোন	সেখ নাঈম হাসান মুন, যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর
	সিনিয়র	এনার্জি সেভিং	মো: জাহিদুল হাসান, যশোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর
	বিশেষ	হেভী থ্রেড কাটার	মো: আবুল কাশেম, রংধনু বিজ্ঞান ক্লাব, যশোর
৩৩. ঝিনাইদহ	জুনিয়র	রেললাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	মো: আকরামুল হোসেন, হরিণাকুন্ডু প্রিয়নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ
	সিনিয়র	Universal Remote Control Home Appliances	মো: মামুন হোসেন, ঝিনাইদহ পলিটেকনিকট ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ
	বিশেষ	মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ট্রেনের দুর্ঘটনা রোধ	মো: লুৎফুল আজিজ সোহাগ, আলফাগামা বিজ্ঞান ক্লাব, ঝিনাইদহ
৩৪. মাগুরা	জুনিয়র	সেচ পরিমাপক যন্ত্র	অনিক কুমার মন্ডল, মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা
	সিনিয়র	গ্রিন হাউজের মাধ্যমে সারাবছর ফল চাষ	জ্যোর্তিময়ী সাহা, মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ, মাগুরা
	বিশেষ	মিনি হ্যাচারী	মো: তামিম হোসেন, অন্বেষণ বিজ্ঞান ক্লাব, মাগুরা
৩৫. নড়াইল	জুনিয়র	বিদ্যুৎ এবং কয়লা চুলা	নিতু, নিধি এবং ফাতেমা, নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নড়াইল
	সিনিয়র	রিমোর্ট কন্ট্রোল ভাইব্রেটিং কার	নবাব আলী শেখ, নড়াইল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, নড়াইল
	বিশেষ	সংবেদনশীল রোবট	টি. আই রুবেল, নড়াইল সায়েন্স ক্লাব, নড়াইল
৩৬. কুষ্টিয়া	জুনিয়র	নিরাপদ রেল ক্রেসিং	রাফিদ ইজতেহাদ, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া
	সিনিয়র	অটোমেটিক পাম্প কন্ট্রোলিং	খোকন আলী ও অন্যান্য, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া
	বিশেষ	পয়ঃবর্জ ও পচনশীল জৈব পদার্থ হতে সুষম জৈব সার	তানভীর আহমেদ ও মো: ইমরান হোসেন, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া
৩৭. চুয়াডাঙ্গা	জুনিয়র		
	সিনিয়র		
	বিশেষ		
৩৮. মেহেরপুর	জুনিয়র	রোড ক্রসিং মডেল ট্রাফিক সিস্টেম	সাদিয়া আক্তার, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর
	সিনিয়র	স্টাটার কালচার পদ্ধতিতে সিউয়েজ আত্তীকরণ	শাহরিয়ার কবির নাইম, মুজিব নগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মুজিব নগর, মেহেরপুর

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৩৯.	রাজশাহী	জুনিয়র	Hand Gesture Control Robot	ফাতিমা আহমেদ, রাজশাহী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রাজশাহী
		সিনিয়র	CNC Router	শরিফুল ইসলাম, রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী
		বিশেষ	College apps	রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
৪০.	নওগাঁ	জুনিয়র	স্বল্প মূল্যে স্বল্প ব্যয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ফ্রিজ	দেওয়ান মামদুদ আহম্মদ, নওগাঁ কে ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ
		সিনিয়র	লজিকগেট ও থিপ ক্যাচার	তন্ময় কবিরাজ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগা
৪১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জুনিয়র	আলোর প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	মো: কামরুল হোসেন, গ্রীন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		সিনিয়র	উপকূলীয় অঞ্চলে মোবাইলের সাহায্যে সতর্ক বাণী প্রচারে এফ.এম. রেডিও স্টেশন	মো: মিনহাজুল ইসলাম, নবাবজান সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		বিশেষ	Free alram and Calling Device	রিয়াজুল জান্না, পদ্মফুঁড়ি বিজ্ঞান ক্লাব, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪২.	নাটোর	জুনিয়র	স্মার্ট রেল ক্রেসিং	মুনতাসির মুয়িদ, নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর
		সিনিয়র	পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস প্লান্ট	অঞ্জুন সুলতানা, কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর
৪৩.	পাবনা	জুনিয়র	ওয়াটার লেভেল ইনডেকটর এবং এফ. এম. রেডিও স্টেশন	খন্দকার রেহমান আলী, পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা
		সিনিয়র	স্মার্ট হোম	মেহেদী হাসান, পাবনা ইসলামীয়া ডিগ্রী কলেজ, পাবনা
		বিশেষ		মো: রফিকুল ইসলাম, ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র, পাবনা
৪৪.	সিরাজগঞ্জ	জুনিয়র	অটোব্রেকিং সিস্টেম	সালিম সাদমান, বি এল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
		সিনিয়র	সাশ্রয়ী গ্যাস বার্নার	উপমা ঘোষ, উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ, সিরাজগঞ্জ
		বিশেষ	সুপার রোবট এস.পি. ম্যাক্স প্রো	কে এম মসিউর রহমান সংলাপ, ট্যালেন্ট সায়েন্স ক্লাব, সিরাজগঞ্জ
৪৫.	বগুড়া	জুনিয়র	Robot with voice Control	মো: মাশকুরুল হাসান, বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া
		সিনিয়র	মিনি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্লান্ট	মো: সালাউদ্দিন কায়সার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, বগুড়া
		বিশেষ	Laser Spyrograph	মো: ইনজামাল-উল-আলম, মৌচাক বিজ্ঞান ক্লাব, বগুড়া
৪৬.	জয়পুরহাট	জুনিয়র	ফ্লায়িং সোসার	সাজ্জাতুল হোসেন, বামদৌ কাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট
		সিনিয়র	ফায়ার কপ	মো: তামিম চৌধুরী মাহি, রামদেও কাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট
		বিশেষ	পানির ট্যাংকে পানির অবস্থান নির্ণয়	মিনহাজুল হোসাইন, জয়পুরহাট সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট

সিলেট বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৪৭.	সিলেট	জুনিয়র	সেফটি বেড	তোফায়েল আহমদ, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট
		সিনিয়র	ডিজিটাল হোম সিস্টেম	মো: স্বপন মিয়া, সিলেট পলিটেনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট
		বিশেষ	ওয়াটার লেবেল ইন্ডিকেটর	রুমা দাস, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
৪৮.	মৌলভীবাজার	জুনিয়র	কম খরচে পানি থেকে লোহা বিমুক্তকরণ	মো: আল ইশরাম নয়ন, জিরেনিয়াম স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার
		সিনিয়র	অটোমেটিক স্ট্রিট লাইট	পার্থ সিংহ, কমলগঞ্জ গণ মহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
৪৯.	হবিগঞ্জ	জুনিয়র	ফার্স্ট নেটওয়ার্ক এন্টিনা	মো: মাইন উদ্দিন, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ
		সিনিয়র	সৌরবিদ্যুৎ চালিত দূর নিয়ন্ত্রিত নৌযান	মো: রাজু মিয়া, হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, হবিগঞ্জ
৫০.	সুনামগঞ্জ	জুনিয়র	স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন	কিংশুক গোস্বামী ও চয়ন দাস, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ
		সিনিয়র	বর্জ্য ব্যবস্থপনা	মো: নজরুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ
		বিশেষ	দুর্ঘটনা রোধে নিরাপদ গাড়ী	ডা: মো: সাইফুল ইসলাম সিরাজী (সাইজি), সুনামগঞ্জ

বরিশাল বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৫১.	বরিশাল	জুনিয়র		
		সিনিয়র		
		বিশেষ		
৫২.	ঝালকাঠি	জুনিয়র	Automatic Security	সুদিপ্ত কর্মকার, ঝালকাঠি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি
		সিনিয়র	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নিরাপত্তা যন্ত্র	তুরাব তামিম রাদ, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি
		বিশেষ	আধুনিক চুল্লি	কৃষ্ণা রানী, রিংকু দাস, আশিষ স্বর্ণকার ও দুলাল কৃষ্ণ দাস, দুলাল রিসার্চ ল্যাব, ঝালকাঠি
৫৩.	পিরোজপুর	জুনিয়র		
		সিনিয়র		
		বিশেষ		
৫৪.	ভোলা	জুনিয়র		
		সিনিয়র		
		বিশেষ		
৫৫.	পটুয়াখালী	জুনিয়র (ভৌত)	ডিজিটাল মিটার	মো: রিফাত ও তার দল, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, পটুয়াখালী
		জুনিয়র (জীব)	ডায়াবেটিস নিরাময়ে ভেষজ নির্যাস	নাইমুল হাসান নিহাব, লতিফ মিউনিসিপ্যাল সেমিনারী, পটুয়াখালী
		সিনিয়র (ভৌত)	ইউনিভারসাল চার্জার	মো: কাইয়ূম, পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী
		বিশেষ		

৫৬.	বরগুণা	জুনিয়র	সিকিউরিটি অব ব্রিজ	মো: আসলাম, জর্জ স্কুল বিজ্ঞান ক্লাব, বরগুণা
		সিনিয়র	মিনি উন্ড টারবাইন	শরীফুল ইসলাম, আমতলী ডিগ্রী কলেজ, বরগুণা
		বিশেষ	রোবট	মো: জাহিদুল ইসলাম, জর্জ স্কুল বিজ্ঞান ক্লাব, বরগুণা

রংপুর বিভাগ :

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৫৭.	রংপুর	জুনিয়র	প্রোডাকশন অব ইলেকট্রনিক ফর্ম গার্বেজ	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
		সিনিয়র	পরিবেশবান্ধব অটো সাইকেল গাড়ি	কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
		বিশেষ	ফ্রিল্যান্সিং সলিউশন	ফ্রিল্যান্স সলিউশন ক্লাব, রংপুর
৫৮.	কুড়িগ্রাম	জুনিয়র	Automatic Power Saving System	আযান মাহমুদ, কুড়িগ্রাম সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
		সিনিয়র	১. কৃষি সমস্যা সমাধান বিষয়ক ওয়েবসাইট ২. Rescue Robot	মো: মোরছালিন ইসলাম, কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম
		বিশেষ	উইন্ড মিলের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন	মো: মতিউর রহমান, নেপচুন বিজ্ঞান ক্লাব, কুড়িগ্রাম
৫৯.	লালমনিরহাট	জুনিয়র	বন্যা নিয়ন্ত্রন পূর্বাভাস	কে এম মৌতাছিম বিল্লাহ এবং এম মেহেদী হাসান, আদিতমারী গিরিজ শংকর মডেল স্কুল, লালমনিরহাট
		সিনিয়র	লেজার লাইটের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা	মো: ইব্রাহীম রাশেদ, লালমনিরহাট টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, লালমনিরহাট
৬০.	নীলফামারী	জুনিয়র	পরিবেশবান্ধব ও টেকশই ইটভাটা	মো: নূর নবী ইসলাম, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয়, নীলফামারী
		সিনিয়র	আধুনিক বাংলাদেশের যোগযোগ ও নিরাপত্তাব্যবস্থা	আরিফুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল রিফাত, লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী
৬১.	গাইবান্ধা	জুনিয়র		আমার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, গাইবান্ধা
		সিনিয়র		গাইবান্ধা সদর উপজেলা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধা
		বিশেষ		উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব, গাইবান্ধা
৬২.	দিনাজপুর	জুনিয়র	বায়োগ্যাস ও ইলেকট্রিসিটি টেকনোলজি	মাহি, রিওন, পলক, হাসান, বর্ষা, আজমাইন, নাঈমা ও সৌরভ, দিনাজপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর
		সিনিয়র	কীটনাশক ছাড়াই মোকামাকড় দমন	আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর
		বিশেষ	বিজ্ঞান ও ভবিষ্যতের দিনাজপুর	ম্যাথ ক্লাব, দিনাজপুর
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	জুনিয়র	রোড সেফটি	এইচ, এফ ইবতিহাল উৎস, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও
		সিনিয়র	রোড সেফটি	মো: খোরসেদুল হক, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও
৬৪.	পঞ্চগড়	জুনিয়র	ডিসএবিলিটি ওভারকাম সিস্টেম এবং থ্রিডি প্রজেক্ট	রাকিন মুয়িদ মনন, ফয়সাল আজিজ, মুহা আসেফ আবরাব, মো: ফয়সাল মুরাদ ও অরিন্দম বি. পি, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়
		সিনিয়র	সিকিউরিটি এলার্ম	আবুল হায়াত, উদ্দিপ্ত রায়, তানভির হাসান ও ওয়াকিল আনাম অনিক, এম আর সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়
		বিশেষ	পরিবেশ দূষণমুক্ত নিরাপদ সড়ক	মুকিত আলম, শামীম ও আবির, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান চক্র, পঞ্চগড়

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANSDOC Library * Dhaka *
BANSDOC Library * Dhaka *

▶ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের সময়

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০
(শুক্র বার সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা এবং দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত)
বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য
4D movie
প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য
যোগাযোগ করুন
www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮